ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ।

বীজাণুতত্ত্ব ও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগের ইতিহাস,
নিদান ও প্রতিষেধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা।

ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-
বিশারদ প্রণীত।

কলিকাতা,
১০নং রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট হইতে
বি, কে, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯২০।

মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।

উৎসর্গ

যিনি এই রোগ-প্লাবিত বঙ্গদেশে উপযুক্ত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য অদম্য অধ্যবসায় ও অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—বর্ত্তমান "কারমাইকেল্ মেডিকেল কলেজ" যাঁহার জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি—সেই পুণ্যব্রত ডাক্তার

আর, জি, কর

এল, আর, সি, পি : এল, এম (এডিন্)

মহোদয়ের

পবিত্র নামে—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

বিজ্ঞাপন।

"ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ" "আর্য্যাবর্ত্ত" নামক মাসিক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনই আমার কয়েকজন বন্ধু ইহাকে পুস্তকাকারে বাহির করিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু সময় ও সুযোগ অভাবে এতকাল ঘটিয়া উঠে নাই।

প্রথমে যে ভাবে সন্দর্ভগুলি মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছিল এবার তাহার কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইল আবার স্থানে স্থানে অনেক আবশ্যক বিষয়ও সংযোজন করা গেল। এখন এই পুস্তক চিকিৎসাশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কিছু উপকারে আসিলেই আমার পরিশ্রম সফল হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমার পরম বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র এল. এম. এস. ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ভিষগাচার্য্য মহাশয়দ্বয় এবং সোদরপ্রতিম শ্রীমান মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এই পুস্তক প্রণয়ন কালে আমাকে অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

গোবরডাঙ্গা।
২৪ পরগণা।
মে, ১৯২০।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র

ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ।

রোগ—বীজাণু।

এই "ব্যাধি-মন্দির" মানব-দেহে প্রতিদিন কত শত রোগ-বীজ কত ভাবে প্রবেশ করিতেছে, তাহা ভাবিলে জ্ঞানহারা হইতে হয়। বৃক্ষ গুল্মাদির বীজ যেমন আমাদের বাসভবনকে আশ্রয় করিয়া অঙ্কুরিত হয় এবং কালক্রমে শাখা-প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক উহাকে পাতিত করে, ব্যাধি-বীজও তেমনই দেহ—গেহে নানাভাবে প্রবিষ্ট হইয়া বংশবৃদ্ধি করত উহাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। পাশ্চাত্য বীজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষা প্রভৃতি সকল রোগেরই বীজাণু আছে। এমন কি, তোমার যদি সর্দ্দি হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে সর্দ্দির বীজাণু তোমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে পীড়িত করিয়াছে। এত কাল যে জরাকে আমরা বয়োধর্ম্ম বলিয়া জানিতাম, এখন তাহাও

বীজাণুঘটিত রোগ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমাদের অন্ত্র মধ্যে নানা জীবের বসতি আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল জীবাণু দলপুষ্ট হয়। তখন তাহাদের গাত্র নিঃসৃত রস সমস্ত মানব-দেহে ব্যাপ্ত হইয়া বার্দ্ধক্য আনয়ন করে। একবার পারিসের পাস্তুর চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহাত্মা মেচ্‌নিকফ্ ঐ বিষময় রস সূক্ষ্মাগ্র পিচকারি দ্বারা এক বাঁদরের শরীরে প্রবিষ্ট করান। দেখিতে দেখিতে জরার তাড়নায় কপিরাজের পৃষ্ঠ ভগ্ন, কটি মগ্ন ও দেহ রুগ্ন হইয়া পড়িল। তাহার লোমরাজিও শুভ্রবর্ণ ধারণ করিতে বিলম্ব করে নাই।

জীব ও উদ্ভিদ্ ভেদে বীজাণু দুই প্রকার। ডাক্তাররা জীবাণুকে Protozoa এবং উদ্ভিজ্জাণুকে Bacteria নামে অভিহিত করেন। উদ্ভিজ্জাণুর মধ্যে যাহারা ঈষৎ দীর্ঘাকার তাহারা Bacilli এবং যাহারা গোলাকার তাহারা Cocci সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ফল কথা, কি প্রাণিজাতীয় কি উদ্ভিদ্‌জাতীয় সকল বীজাণুরই জীবনীশক্তি আছে। এজন্য উহাদিগকে এক কথায় "জীবাণু" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

বীজাণু সর্ব্বব্যাপী ; জলে, স্থলে, অনিলে ইহারা আত্মগোপন করিতে পারে। আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকরা যখন সম্মার্জ্জনীর দ্বারা ঘর-দ্বার পরিষ্কৃত করেন, তখন সেই ধূলি-মলের মধ্যেও অসংখ্য বীজাণু বিদ্যমান থাকে। জল, বায়ু ও খাদ্যাদি সংযোগে এই বীজাণু আমাদের দেহাভ্যন্তরে চলিয়া যায়। কোন কোন বীজাণু মশা, মাছি, ইন্দুর প্রভৃতির দ্বারাও মানব-দেহে

সংক্রামিত হয়। ভূয়োদর্শন দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটি মক্ষিকা তাহার পক্ষ ও পদের সাহায্যে ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ হইতে ৬৬০০০০০ ছয়ষট্টি লক্ষ রোগ-বীজাণু বহন করিতে পারে।

বীজাণুগণ অণুদেহী। ইহাদের আকার এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত আমরা চর্ম্ম চক্ষুতে উহাদিগকে দেখিতে পাই না। কোন কোন রোগের বীজাণু অণুবীক্ষণেও আমাদের নয়নগোচর হয় না। বীজাণুর শারীরিক গঠনেরও বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। কোন কোনটি বর্ত্তুলাকার; কোন কোনটি অনতিদীর্ঘ সরল রেখাকার। আবার কাহারও কাহারও দেহ জয়ঢাক বাজাইবার যষ্টির অনুরূপ। ইহারা অত্যন্ত ক্লেশ-সহনশীল; বরফের মধ্যে রাখিয়া দিলেও এক একটি দীর্ঘকাল সজীব থাকে। প্রখর রবিতাপে ও ফুটন্ত জলে সকল বীজাণুই গতায়ুঃ হয়।

অণুদেহী হইলেও বীজাণুর শক্তি অসীম। একটি বিশাল-কায় বলিষ্ঠ জীবকে ইহারা অল্পকালের মধ্যেই অবসন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। ভারতের প্রসিদ্ধ পলোয়ান্ গোলামের যখন ওলাউঠা হয়, তখন কয়েকবার মাত্র ভেদের পর তিনি এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে হস্তোত্তলন করিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে পারেন নাই। তৎকালে সেই মুমূর্ষু বীরবর ক্ষোভে কম্পিতকণ্ঠে বলিয়াছিলেন "হায়! রোগের কি অসীম শক্তি। একদিন যে হস্ত দ্বারা আমি অবলীলাক্রমে উপলখণ্ড

সকল চূর্ণ করিয়াছি, আজ এই মহাপ্রয়াণ দিনে সেই হস্ত এতদূর হীনবল হইয়াছে যে আমার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে সে একবার শেষ আলিঙ্গন করিতে পারিল না ” এড়িয়াদহ নিবাসী, কাশী প্রবাসী মদীয় জনৈক বন্ধু মুষ্ঠ্যাঘাতে ঝুনা নারিকেল ভগ্ন করিতে পারিতেন। তাঁহার ন্যায় দৈহিক বল বাঙ্গালীর মধ্যে অল্প লোকেরই দেখিয়াছি। একদা বন্ধুবর জ্বরাতিসারে আক্রান্ত হইলে আমি চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম; মিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম দুই দিনের জ্বরেই তিনি উত্থানশক্তি রহিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া মূত্রপুরীষাদি পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিয়াছিলাম “কি হে! দুই দিনের অসুখে এত কাতর হইয়াছ?” তদুত্তরে ক্ষীণকণ্ঠে বন্ধু বলিলেন “ভায়া, এক মুষ্ঠ্যাঘাতে অমুক পালোয়ানের উরু ভগ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু দুরন্ত রোগ আমার মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়াছে।”

তাই বলিতেছিলাম রোগ-বীজাণুর শক্তি অসীম। ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় ইহারা মত্ত মাতঙ্গ অপেক্ষাও অধিক বলশালী; সভ্যতালোকদীপ্ত স্থানের লোকেরা অধুনা এই বীজাণুর ভয়ে এতাদৃশ ভীত যে তাহাদের মধ্যে “বীজাণু-বায়ু” নামে এক প্রকার অভিনব ব্যাধি দেখা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম ফরাসীদেশের রাজধানী পারিস সহরে এক বীজাণু-বায়ুগ্রস্তা বিদুষীবালা প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া একটি সুবৃহৎ বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ঐ ভবনে তিনি বসতি

করেন। বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা যে বায়ু বীজাণুশূন্য করা হইয়াছে তাহাই ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে। খাদ্যপানীয়াদিও সম্যক্ বীজাণুশূন্য না করিয়া ঐ রমণী গ্রহণ করেন না। তিনি যে স্থানে বিচরণ করেন, তৎস্থানও বীজাণুরহিত। বোধ হয়, এই সভ্যা শ্বেতাঙ্গী আমাদের "হনুমান—বিভীষণের" ন্যায় অমরত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

রোগ-বীজাণু দেহ-প্রবিষ্ট হইয়া যে ভাবে বংশবৃদ্ধি করে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রথমে একটি বীজাণু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি হয়। ঐ দুইটি হইতে আবার চারিটি হইয়া থাকে। এই রূপে অল্পকাল মধ্যে একটি জীবাণু হইতে বহুসংখ্যক জীবের সৃষ্টি হয়। ঐ সকল জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাণুর গাত্র নিঃসৃত রসই আমাদের শরীরে নানাপ্রকার সাংঘাতিক রোগ আনয়ন করে। পীড়িত ব্যক্তির মল, মূত্র ও বমিত পদার্থাদির সহিত রোগ-বীজাণুগণ আবার নির্গত হইয়া জলে-স্থলে বা ব্যোমপথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়।

যে কোন রোগের বীজাণু মানব-দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই যে সকল সময় রোগানয়ন করিতে পারে, একথা বলা যায় না। আমরা একটু জলপান করিলাম, অমনই ঐ জলটুকুর সহিত অসংখ্য বারি-সহায় বীজাণু আমাদের জঠর মধ্যে চলিয়া গেল। প্রতি শ্বাসগ্রহণে কত কোটি কোটি বীজাণু বায়ুর স্কন্ধে চড়িয়া আমাদের ফুস্ফুস মধ্যে উপস্থিত হইতেছে। কিন্তু কৈ, আমরা ত সকল সময় পীড়িত হই না। পরম

কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের দুরবস্থা বিবেচনা করিয়াই প্রাগুক্ত মহাশত্রুর উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার এক সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিধি আমাদের শরীরে এমন একটি ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি দিয়াছেন, যাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া রোগ-বীজাণুগণ প্রায়শঃ পঞ্চত্ব পায়। আমাদের রক্তস্থ শ্বেত কণিকাই আমাদের রক্ষক এবং উহারাই ঐ সকল রোগ-বীজাণুর ভক্ষক।

মনুষ্য-রক্ত মোটামুটি ত্রিবিধ সামগ্রীর সমবায়ে প্রস্তুত। রক্তের তরল পদার্থকে রক্তরস বা "সিরাম্" বলে। ঐ রক্তরসের মধ্যে শ্বেত ও লোহিত দুই প্রকারের কণিকা আছে। ঐ কণিকাগুলি এতাদৃশ সূক্ষ্ম যে চর্ম্ম চক্ষুতে উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না*। চক্ষুর চক্ষু অণুবীক্ষণের দ্বারা আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই। সুস্থ রক্তে শ্বেত কণিকা অপেক্ষা লোহিত কণিকার সংখ্যা ৩৭০ গুণ অধিক। এক সূচ্যগ্রবিন্দু মনুষ্যরক্তে ৫০ লক্ষ লোহিত কণিকা ও প্রায় ১৫ সহস্র শ্বেত কণিকা থাকিতে পারে।

রোগ-বীজাণু রক্তে প্রবেশ করিলেই চতুর্দ্দিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় শ্বেতকণিকাদল আসিয়া উহাদিগকে সমরশায়ী করে এবং একে একে সকলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

* শ্বেত কণিকার ব্যাস (Diameter) ১/৩০০০ ইঞ্চি এবং লোহিত কণিকার ব্যাস ১/৩২০০ ইঞ্চি।

আমাদের শরীরে রোগ-বীজাণুর সহিত শ্বেত কণিকার এই সংগ্রাম অবিরাম চলিতেছে।

জনাকীর্ণ স্থানে বাস, দুশ্চিন্তা, কদাহার, অত্যন্ত পরিশ্রম, শীতাতপ সেবন প্রভৃতি যে কোন কারণে রক্তের শ্বেত কণিকাগুলির অরুচি রোগ জন্মিলে আমাদের আর রক্ষা নাই। তখন রোগ-বীজাণুসকল নির্ব্বিঘ্নে বংশবৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে পীড়িত করিয়া ফেলে। যতক্ষণ আমাদের রক্তে শ্বেত কণিকা সতেজ থাকে, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ্ থাকিতে পারি। তখন রোগ-বীজাণু দেহ-প্রবিষ্ট হইলেও রোগানয়ন করিতে পারে না।

আমাদের পাকস্থলীর অম্লরসে (Gastric juice) পড়িয়াও অনেক সময় অনেক বীজাণু প্রাণ হারায়। ঐ রসের প্রভাব উহারা সহ্য করিতে পারে না।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—" Prevention is better than cure "—অর্থাৎ রোগ হইলে তাহার শান্তি করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হয় সেই চেষ্টা করাই সমীচীন। কতকগুলি প্রধান প্রধান রোগের বীজাণু কি উপায়ে মানব-দেহে সংক্রামিত হয় এবং কেমন করিয়াই বা আমরা তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি তাহা একে একে বলা যাইতেছে।

ম্যালেরিয়া জ্বর।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ একদিন এই ফল-ফুল-শালিনী শস্যভরা বঙ্গভূমিকে "Paradise on earth" অর্থাৎ ভূস্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ১৮০৭ অব্দে ও তাৎকালিক গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো মহোদয় বাঙ্গালীর দৈহিক গঠন দেখিয়া আনন্দে লিখিয়াছিলেন,—

"I never saw so handsome a race. They are much superior to Madras people, whose forms I admired also. Those are slender, these are tall, muscular, athletic figures perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. These features are of the most classical European models with great variety at the same time."

এখন আর সে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী নাই। "ভূস্বর্গ" এখন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। তাহার পল্লীগুলি বুঝি নিষ্প্রদীপ হইতে বসিল। ম্যালেরিয়া-জীর্ণ পল্লীবাসীর দেহ এখন ব্যাধির সামান্য তাড়নায় পরাভূত হইয়া জীবনবৃন্ত হইতে বিচ্যুত হইতেছে।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এই জনপদধ্বংসকারী ব্যাধি এরূপ প্রবলভাবে ও স্থায়ীরূপে ছিল না বলিয়াই বোধ হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার আমেজান ও আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর উভয় কূলবর্ত্তী ভূখণ্ডে এবং ইটালির কাম্পানা নামক জলাভূমিতে অনেক দিন হইতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের কথা শুনা যায়। এক সময়ে ইংলণ্ডেও ইহার প্রভাব কম ছিল না। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে যশোহর জেলায় আরব্ধ হইয়া ইহা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। কথিত আছে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ৭০০ শত কয়েদী ঢাকা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল। যশোহরের মহম্মদপুর গ্রামে কার্য্য করিবার সময় তাহারা হঠাৎ দুরন্ত জ্বররোগে আক্রান্ত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তন্মধ্যে দেড় শত লোক দেহত্যাগ করিল। অতঃপর সাত বৎসর ধরিয়া এই জ্বর অতি প্রবলভাবে তদ্দেশবাসী জনগণকে বিধ্বস্ত করিতে থাকে।

১৮৩৩ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া গদখালিতে মহামারী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহা বনগ্রাম ও চাকদহে আসে এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বীরনগর বা উলা ধ্বংস করিয়া কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, নৈহাটী, ত্রিবেণী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই জ্বর বর্দ্ধমানে নবপ্রবেশ করে। বর্দ্ধমানবাসী ইতঃপূর্ব্বে যে স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেছিল, এই বৎসর হইতে তাহা অন্তর্হিত হইল। তাহাদের ভাগ্যাকাশে প্রলয়ের চিহ্নস্বরূপ ধূমকেতু দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে কয়েক বর্ষের মধ্যেই ঐ প্রদেশের জনপদগুলি শ্মশানে

পরিণত হইতে বসিল। রোগে, শোকে লোক ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িল। দেশের সংবাদপত্রসমূহ গভর্ণমেণ্টের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য দুন্দুভিনাদে এই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ বিঘোষিত করিতে লাগিল। ইহার অল্পদিন পরেই ম্যালেরিয়া হুগলি ও হাওড়া জেলায় প্রবেশ করিয়া তদ্দেশবাসীরও সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করে। এখন বাঙ্গালার সমস্ত জেলাতেই ইহার সমান অধিকার। ইহার উৎপাতে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর সন্তান সন্ততিগণ জীর্ণ, শীর্ণ ও কঙ্কালসার। বাঙ্গালীর সে পুষ্টদেহ, তুষ্ট মন আর নাই। সেই বলদৃপ্ত পদবিক্ষেপের স্থলে এখন তাহারা অতি কষ্টে দেহভার বহন করিয়া ক্লান্ত পদে বিচরণ করিতেছে। এই বিষম ব্যাধির আলিঙ্গন ভয়ে ভীত হইয়া লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া সহরবাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রয়াণে বঙ্গপল্লীর যে দশা ঘটিয়াছে, সে দৃশ্য দেখিলে মৃত কবির সেই শোকোচ্ছ্বাস মনে পড়ে,—

> "কি দুর্দ্দশা! ছিল যথা বাসগৃহশ্রেণী কত,
> কোলাহল মুখরিত মধুকর চক্রমত,
> খান কত জীর্ণ ঘর রহিয়াছে সেথা আজি,
> ঘিরিয়াছে চারিদিকে তৃণগুল্ম বনরাজি!
> ধনীর প্রাসাদ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়েছে ভূমে,
> মন্দির, প্রাচীর, স্তম্ভ সকলি মেদিনী চুমে!
> ভাঙ্গিয়াছে বাঁধাঘাট নিবিড় শৈবালদল,
> করিয়াছে জলাশয় সমল পঙ্কিল তল!

জন যাতায়াত শূন্য পল্লীপথগুলি পাশে,
দু'ধারে ঘিরেছে বনে, বিকট কণ্টক হাসে !
যে হয়েছে কৃতবিদ্য, লভেছে সম্পদ বল,
সেই করিয়াছে ভিটা শ্বাপদ ভ্রমণ স্থল।"

যে ম্যালেরিয়ার পৈশাচিক অত্যাচারে বাঙ্গালার শান্ত, স্নিগ্ধ পল্লীগুলি আজ মহাশ্মশানে পরিণত—যাহার কবলে পড়িয়া প্রতি বৎসর প্রায় দশ লক্ষ বঙ্গবাসী অকালে ভবের খেলা সাঙ্গ করিতেছে—সেই ম্যালেরিয়ার নিদান নির্ণয়ের জন্য অনেক সময় অনেক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিগণের মতে জলাভূমিতে লতাগুল্মাদি পচিয়া যে বিষ-বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাই ম্যালেরিয়ার কারণ। আবার কেহ কেহ বলিতেন, দূষিত জলপানেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সৈনিকদলের ডাক্তার ল্যাভেরন্ এই রোগের প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত করিয়া জগদ্বাসীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এক প্রকার জীবাণুই (Plasmodium) এই দুরন্ত জ্বরের জনয়িতা*। এই জীবাণুগণ অণুদেহী এবং এক কোষযুক্ত। ইহারা সহস্রগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে এক একটি বৈঁচ ফলের ন্যায় দৃষ্ট হয়। আদিতে জলে কিংবা স্থলে কোথায় ইহারা প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার নিশ্চয়তা নাই।

* এক দিন অন্তর জ্বর, পালাজ্বর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু আছে।

কিউলেক্স জাতীয় (Culex) মশকগণ গোদ রোগের জীবাণু বহন করে। ইহা দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমেই মহামতি ম্যান্‌সন্ অনুমান করেন যে ম্যালেরিয়া-জীবাণুও বোধ হয় ঐরূপ কোন জাতীয় মশকের দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থদেহে সংক্রামিত হয়। তাঁহার অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ডাক্তার রস্ নানাজাতীয় মশক লইয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহাত্মা সপ্রমাণ করেন যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশকই ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক*। তিনি বলেন—

" Malaria is due to miasma given off by marsh, but the miasma is not a gas or vapour, it is a living insect. The germs of malaria do not live in the marsh, it is the carriers of the germs which live there. The anopheles themselves are the malarial miasma."

এনোফিলিস্ মশক রোগীর দেহে হুল বিদ্ধ করিয়া রক্তপান-কালে রোগ-জীবাণু টানিয়া লয়। কয়েক দিবস পরে মশক দেহে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই অবস্থায় ঐ মশক কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলেই মশকের লালার সহিত

* 'ষ্টেগোমাইয়া ফ্যাসিয়েটা" নামক মশক পীত জ্বরের বীজাণু বহন করে। কালাজ্বর এক প্রকার ছারপোকা দ্বারাই সংবাহিত হয়। " Relapsing Fever "এর (এক প্রকার বিশেষ জ্বরের) বীজাণু আটালুর দ্বারাই মানব-দেহে সংক্রামিত হয়।

ম্যালেরিয়া-জীবাণু দষ্ট ব্যক্তির রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া রোগানয়ন করিতে সমর্থ হয়।

অল্পদিন হইল বিলাতের অধ্যাপক ডাক্তার এ, ই, সিপ্‌লে মহোদয় এনোফিলিস্ মশকের গতি-প্রকৃতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে পুরুষ মশকের দংশন দ্বারা রোগ বিস্তারের ভয় নাই; মশক পত্নীরাই বিষবাহিকা। উহারা দংশনকালে দষ্টস্থানে ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। ঐ ডিমের সঙ্গে রোগ-জীবাণু দেহপ্রবিষ্ট হইয়া ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি করে।

মশকগণ যেমন সকলে মিলিয়া গুণ গুণ স্বরে গীত গাহিতে থাকে, মশকীরা সেরূপ করে না। তাহারা চোরের ন্যায় নিঃশব্দে আসিয়াই আমাদের দেহে হুলবিদ্ধ করে।

মহাত্মা সিপ্‌লে দীর্ঘ ১৫ বৎসরকাল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মশক সম্বন্ধে আরও যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা এই,--

হরিদ্রা এই জাতীয় মশকের প্রধান শত্রু; হরিদ্রার গন্ধে উহারা মরিয়া যায়। যে ঘরে অধিক পরিমাণে হরিদ্রা চূর্ণ থাকে তথায় মশকের প্রবেশাধিকার নাই। উহারা ঐ দ্রব্যকে এত ভয় করে যে হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রের উপরেও বসিতে সাহস করে না।

নীলরংটি ইহাদের বড়ই প্রিয়। তাই ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া গিয়া নীলাম্বরেই বসিয়া থাকে। নীলাম্বর পাইলে

আর কোন স্থানে উহারা বসিতে চাহে না। সিপ্‌লে যখন আফ্রিকার মশকপ্রধান স্থানে বাস করিতেন, তখন তিনি তাঁহার তাম্বুর কাপড় নীলরঙ্‌ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে রাত্রিতে যখন তিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেন, তখন একটি মশকও তাঁহাকে দংশন করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইত না; সকলে সেই নীল তাম্বুর উপর বসিয়া মজগুল হইয়া থাকিত।

সিপ্‌লে বলেন মশকের ঘ্রাণশক্তি একেবারেই নাই। তাহারা শব্দ শুনিয়া আহার অন্বেষণে সেই দিকে ধাবিত হয়। যে সকল ব্যক্তি বেশ স্থিরভাবে বসিয়া থাকে—কোন প্রকার শব্দ করে না—তাহাদের দংশনজ্বালা বড় একটা সহ্য করিতে হয় না। বেশী কথাবার্ত্তা কহিলে অথবা যে কোন প্রকার শব্দ করিলেই এই ক্ষুদ্র রাক্ষসের দল পালে পালে আসিয়া ঘাড়ে পড়ে। নিদ্রাবস্থায় যাহাদের নাসিকা গর্জ্জিতে থাকে, তাহাদের আর রক্ষা নাই। খাটের শব্দ, পার্শ্বপরিবর্ত্তনের শব্দ বা ঐরূপ কোন একটি শব্দ শুনিতে পাইলেই উহারা সেই দিকে ছুটিয়া যায় এবং শয়িত ব্যক্তির অঙ্গে বসিয়া হুল ফুটাইতে থাকে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, মশকদংশনেই যদি ম্যালেরিয়া জ্বর হইত তবে সারা বঙ্গদেশে বোধ হয় একটি লোকও সুস্থ থাকিত না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, যে কোন মশক দংশন করিলেই ম্যালেরিয়া জ্বর হয় না। কেবল মাত্র এনোফিলিস্‌ জাতীয় মশকই ম্যালেরিয়া-জীবাণুর বাহক। সাধারণ মশক হইতে এই এনোফিলিস্‌ মশকের অনেক পার্থক্য আছে। একটু লক্ষ্য

করিয়া দেখিলেই সকলে ইহা বুঝিতে পারেন। ঐ মশকের হুলের উভয় পার্শ্বে দুইটি শুঁড় ও পক্ষোপরি ছিট্ ছিট্ চিহ্ন দেখা যায়। ইহারা গৃহভিত্তিতে কখনই সোজা হইয়া বসিতে পারে না—বাঁকা ভাবেই বসে।

নালা, নর্দ্দামা, খানা, ডোবা প্রভৃতি স্থানগুলি এনোফিলিস্ মশকের জন্মস্থান। বর্ষা সমাগমে বঙ্গপল্লীসমূহে যে ম্যালেরিয়া জ্বরের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ ঐ সময়ে খানা, ডোবা জলপূর্ণ হওয়ায় মশকীরা ডিম পাড়িবার সুবিধা পায়। ঐ ডিম হইতে অসংখ্য মশকের জন্ম হয়। মশকতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন প্রত্যেক মশকী এক সময়ে ১৫০ হইতে ২০০ ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়া জীবাণু মশক কর্ত্তৃক মনুষ্য-রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া বংশবৃদ্ধি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। এই রক্তদোষই ম্যালেরিয়া জ্বরের বিপদের হেতু। ডাক্তার রস্ বলেন যে দেশে এনোফিলিস্ নাই, তথায় ম্যালেরিয়া নাই। যে কোন উপায়ে দেশ এনোফিলিস্ শূন্য করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়াশূন্য হইবে। এ কথার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। সে কালে কলিকাতায় মশকের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। "রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কল্কাতায় আছি"—এই প্রচলিত বাক্য অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কলিকাতায় তখন জ্বরেরও একাধিপত্য। লোক ঐ জ্বরকে "পাকাজ্বর" বলিত। কোন কোন বৎসর বর্ষাকালে

এই জ্বরে তথাকার য়ুরোপীয় অধিবাসিবর্গের তিন ভাগ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যে এক ভাগ জীবিত থাকিত, তাহারা প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে একটি আনন্দ-ভোজের অনুষ্ঠান করিত। পূর্ব্বকালে আফ্রিকার কোন জনপদে ম্যালেরিয়ার অতিশয় দৌরাত্ম্য ছিল। অনেক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কর্ম্মোপলক্ষে ঐ স্থানে গিয়া অল্পকাল মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। এই জন্য ঐ স্থানকে লোক শ্বেত মনুষ্যের "গোরস্থান" বলিত। এক্ষণে তথায় ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, ঐ স্থানে আর মশক নাই।

১৮৯৫ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালয় উপদ্বীপে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বিলক্ষণ ছিল। মশক ধ্বংসের ফলে সে স্থানেও ম্যালেরিয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। প্যানেমার অবস্থা ভাবিয়া দেখ। একদা রেল রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য আফ্রিকা হইতে এক সহস্র নিগ্রো আনিয়া প্যানেমায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে তাহারা সকলেই জ্বর রোগে ভবধাম পরিত্যাগ করে। আর একবার ঐ উদ্দেশ্যে তথায় সহস্রাধিক চীনবাসীকে পাঠান হইল। তাহারাও ছয় মাসের মধ্যে নিগ্রোদিগের অনুগমন করিয়াছিল। বিগত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তথায় প্রতি সহস্রে ৮ জন মাত্র ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। প্যানেমাতে ম্যালেরিয়া নিবারণের যে যে উপায় অবলম্বিত হয় তাহা এই—

১। প্রত্যেক বাড়ীর একশত গজের মধ্যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশকার ডিম পাড়িবার স্থানগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়

২। বাড়ীর সান্নিধ্যে যাহাতে মশককুল আশ্রয় লইতে না পারে তাহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল।

৩। প্রত্যেক বাড়ীর লোক, বাড়ীর দরজা, জানালা তাম্রনির্ম্মিত এক প্রকার সছিদ্র আবরণ দ্বারা এরূপ ভাবে আবদ্ধ করিয়াছিল যাহাতে উহার মধ্যে মশক প্রবেশ করিতে না পারে, অথচ বায়ু যাতায়াতের ব্যাঘাত না হয়।

৪। মশকার ডিম পাড়িবার যে স্থানগুলি নষ্ট করা সম্ভব হয় নাই, তথায় কেরোসিন্ তৈল বা তদ্বৎ কোন ডিম্বনাশক বিষ-পদার্থ মধ্যে মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইত।

ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশে বাস করিয়া ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে যাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয় এবং এনোফিলিস্ মশকে দংশন করিতে না পারে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই প্রধান কার্য্য। কোন ঋতুতেই শীতবাতসমাকুল স্থানে অথবা আর্দ্র ভূমিতে শয়ন করা বিধেয় নহে। খাট্ বা পর্য্যঙ্কোপরি শয়নস্থান নির্দ্দেশ করিবে। এনোফিলিস্ জাতীয় মশকগণ প্রায়শঃ দিবাভাগে দংশন করে না; সুতরাং রাত্রিকালে মশারি ব্যবহার ও জামা পরিধান করিয়া মশকের দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিবে*। বাসগৃহগুলি যাহাতে

*কার্ব্বলিক এসিড ৬০ গ্রেণ, জল ৮ আউন্স। এই লোশন অল্প গ্লিসারিনের সহিত মিশাইয়া গাত্রে মাখিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মশায় কামড়াইতে পারে না।

পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে এবং উহার মধ্যে বাতালোক সমানভাবে প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতে হইবে। আঙ্গিনা ও বাসভবনের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে বনজঙ্গল হইতে দেওয়া অনুচিত। বাড়ীর জল যাহাতে সহজেই নিকাশ হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবে। ভদ্রাসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে খানা, ডোবা থাকিলে বর্ষাসমাগমের পূর্ব্বেই উহাদিগকে ভরাট করা কর্ত্তব্য। বাড়ীর সান্নিধ্যে যাহাতে এক বিন্দু জলও কোন স্থানে জমিতে না পারে তদ্বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এই সকল নিয়ম পালন করা বহুব্যয় সাধ্য; কিন্তু আমি বলি, তাহা নহে। অট্টালিকাবাসী ও কুটীরবাসী সকলেই ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ গৃহ স্বাস্থ্যোপযোগী করিয়া রাখিতে পারেন। আমরা বাহিরে লম্বশাট পটাবৃত বাবু সাজিয়া বেড়াইয়া থাকি; কিন্তু ঘরে আসিয়া দেওয়ালের গাত্রে ও খাটের পার্শ্বে কফ, কাস ফেলিতে ত্রুটি করি না। আমাদের বাহিরের বৈঠকখানাটি ঝাড়, বেল প্রভৃতি বহুবিধ আলোকাধারে সজ্জিত; কিন্তু রান্নাঘরের পার্শ্বস্থিত জল নালী ভাত, ফেন ও কদলী পত্রাদি দ্বারা আবদ্ধ।

অবস্থা বৈগুণ্যহেতু খানা, ডোবা ভরাট করিতে অসমর্থ হইলে বর্ষাকালে মধ্যে মধ্যে উহাদের জলে কিছু কিছু কেরোসিন তৈল নিক্ষেপ করিলে অভীষ্ট কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা দ্বারা মশকীর ডিম্বগুলি (Larva) বিনষ্ট হয়। ডাক্তার সার্ কৈলাস চন্দ্র বসু বলেন বাকসের কাঁচা পাতা জলে

ডুবাইয়া রাখিলে মশক ডিম্ব ধ্বংস হয়। পল্লীবাসিগণ এই অনায়াসসাধ্য উপায় ইচ্ছা করিলেই অবলম্বন করিতে পারেন।

পল্লীগ্রামে দেখিতে পাই গৃহস্থগণ বাসগৃহের সম্মুখেই আঁস্তাকুড় করিয়া রাখেন। ঐ স্থানে আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ ও মল-মূত্র ত্যাগ করা হয়। কাহারও কাহারও গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে গোময়স্তূপ পচিতে থাকে। এই সকল পূতিগন্ধময় স্থানে রাশি রাশি মশা-মাছির প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন—"আচার বিচারেই লক্ষ্মীর কৃপা।" এই "আচার বিচারের" কথা যদি তাঁহাদের সকল সময় মনে থাকে তাহা হইলে আমাদের অনেক দুঃখ দূর হয়। সায়ংকালে বাসগৃহে ধূনা-গঙ্গাজল দিয়া তুলসীতলায় দীপ দেখাইলেই কেবল "আচার-বিচার" হয় না। বিষ্ঠামূত্র ও বাড়ীর আবর্জ্জনাগুলি পরিষ্কৃত করিবার ভয়ে প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে জমা করিয়া বাহিরে আচার দেখাইলে কি হইবে? আচার-প্রিয় বঙ্গজননীগণ মিথ্যাচার ত্যাগ করিয়া সদাচার শিক্ষা করিলে বঙ্গগৃহ শান্তিময় হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক উপায়গুলি একে একে বলা হইল। এইবার আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বর্ষা বা শরৎ কালে পল্লীগ্রামে বাস করিয়া মশক দংশন হইতে একেবারে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব বলিলেই চলে। অতএব ঐ সময় বাড়ীর প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে দুই দিনে একুনে অন্ততঃ ১০ রতি কুইনাইন সেবন করিতে ভুলিবে

না। বালকদিগের পক্ষে বয়ঃ অনুযায়ী মাত্রা কম করিয়া লইবে। মনে রাখিও—একমাত্র কুইনাইনই ম্যালেরিয়া-জীবাণুর মৃত্যুশর। তবে উহা অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে ফলপ্রদ হয় না, বরং তদ্দারা ম্যালেরিয়া-জীবাণুর শক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়। এজন্য প্রতিদিন এক আধ্ রতি কুইনাইন সেবন না করিয়া সপ্তাহে দুই দিনে কিছু অধিক মাত্রায় সেবন করাই সুব্যবস্থা।

টাইফয়েড ও কলেরা।

টাইফয়েড জ্বরকে আমাদের ভাষায় অভিন্যাস সান্নিপাতিক জ্বর বলা যায়। জন বহুল সহরেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। ১৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষগণ ইহা দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এক প্রকার জলবাহন জীবাণুই এই রোগের নিদান। সাধারণতঃ দুগ্ধ ও জলের সহিত এই জীবাণু মানবদেহে প্রবিষ্ট হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের নিদাঘকালে বিলাতের কোন একটি বিশিষ্ট গোশালার দুগ্ধ পান করিয়া ৫০০ শত লোক এককালীন এই রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। অবিশুদ্ধ জলেই টাইফয়েড জীবাণু (Typhoid bacilli) অবস্থিতি করে। আমাদের এই নদীমাতৃক বঙ্গদেশে যে সকল স্বল্পতোয়া বা রুদ্ধগতি মজা নদী আছে, তাহাদের জলে এই সকল জীবাণু স্বচ্ছন্দে বংশবৃদ্ধি করিয়া বসতি করিতে পারে। কিন্তু খরস্রোতা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জলের এমন একটি শক্তি আছে যে উহার মধ্যে কোন জীবাণুই অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে না। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, বৎসরাবধি গঙ্গোদক তুলিয়া রাখিলেও তন্মধ্যে কীট জন্মে না। গঙ্গার এইরূপ মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়াই বুঝি স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বলিয়া-

ছিলেন—"তব তট নিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।" শুনিয়াছি দিল্লীশ্বর আকবর শাহ হরিদ্বার হইতে গঙ্গোদক আনাইয়া পান করিতেন। কলিকাতা-বাহিনী গঙ্গার উপস্থিত যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, এবং যে পরিমাণে কলরাশির ও সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্কের ময়লা উহাতে ফেলা হয়, তাহাতে তাহার আবিল ও আবর্জ্জনাময় জল নির্ভয়ে পান করিতে কিন্তু শঙ্কা হয়।

টাইফয়েড জীবাণু উদ্ভিদ্ জাতীয়। ইহারা পানীয়জলের সহিত মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া বংশবৃদ্ধি করত মনুষ্যের প্লীহা, যকৃৎ, অন্ত্র, মূত্রস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রে ব্যাপ্ত হয়। রোগীর মূত্র-পুরীষের সহিত জীবাণুগুলি আবার নির্গত হইতে থাকে। বীজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন এক সূচ্যগ্রবিন্দু মূত্রে সহস্র সহস্র এই জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগীর মল-মূত্রে মক্ষিকা বসিয়া পরে ঐ মাছি আবার খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলে খাদ্যদাতা ও গৃহীতা উভয়েরই এই রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

টাইফয়েড রোগী নিরাময় হইলেও তাহাদের শরীরে সুদীর্ঘ কাল* এই রোগ-জীবাণু জীবিত থাকে। তখন তাহারা আশ্রয়-দাতার বিশেষ কোন অনিষ্ট করে না বটে কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি যে কোন স্থানে গিয়া পান-ভোজন ও মল-মূত্র ত্যাগ করিলেই তৎস্থানে রোগ বিস্তার হইতে পারে। একদা বিলাতের বৃষ্টল

*কেহ কেহ বলেন ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্তও থাকিতে পারে।

সহরের কোন আতুরাশ্রমে এক শ্বেতাঙ্গী শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্ত হ'ন। তিনি হাঁসপাতালে প্রবিষ্ট হইলেই তথাকার লোকদিগের মধ্যে টাইফয়েড জ্বর দেখা দেয়। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ নবাগত রমণীর দেহে রোগ-জীবাণুর ভাণ্ডার রহিয়াছে। ঐ বিষভাণ্ডোদরী কর্ম্মচ্যুত হইলে রোগও অদৃশ্য হইল।

পশুদিগের মধ্যেও টাইফয়েড জ্বর হইয়া থাকে। কোন সময়ে জার্ম্মাণী দেশে টাইফয়েড রোগগ্রস্ত গো-বৎসের মাংস ভক্ষণ করিয়া অনেকগুলি লোক এই রোগাক্রান্ত হয়।

জলবাহন জীবাণুগুলির মধ্যে কলেরা বা ওলাউঠা রোগের বীজাণু অন্যতম। ইহারাও উদ্ভিদ্ জাতীয়। এই উদ্ভিজ্জাণু-গুলির আকার ইংরাজী কমা চিহ্নের ন্যায় বলিয়া ডাক্তাররা উহাদিগকে "কমাবেসিলাস" ("Comma bacillus") আখ্যা দিয়াছেন। ওলাউঠা রোগীর মল ও বমিত পদার্থে এই উদ্ভিজ্জাণু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা চর্ম্ম চক্ষুতে উহাদিগকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে যখন দেখি এক বিন্দু মলে সহস্র সহস্র "কমাবেসিলাস" পুচ্ছ পরিচালন করিয়া বেড়াইতেছে, তখন বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে বলিতে ইচ্ছা হয়, ধন্য বীজতত্ত্ববিদ্ মহাত্মাগণ! ধন্য বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান!

অনেকদিন হইতে এই কালান্তক ব্যাধি—ওলাউঠা—এতদ্দেশে আধিপত্য করিতেছে। তবে ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় ইনি সর্ব্বদাই মনুষ্য-সমাজে বাস করেন না। মানবজাতি ঘন ঘন

ইঁহার প্রেমালিঙ্গন লাভ করিলে এতদিনে বুঝি সৃষ্টি লোপ পাইত। বৎসরের মধ্যে দুই দশ দিনের জন্য ইনি বাঙ্গালার যে জনপদগুলিতে পরিভ্রমণ করেন, তাহাতেই অনেক সংসার ছারখার হইয়া যায়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকালে ইনি একবার রাক্ষসীমূর্ত্তিতে লর্ড হেষ্টিংসের সেনাদলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইঁহার "শুভাগমনে" সপ্তাহকাল মধ্যে ৭৬৪ জন সৈন্য ও তাহাদের ৮০০০ সহস্র সঙ্গী চিরতরে মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গলাদেশের মধ্যে যশোহরই ইহার প্রথম লীলাক্ষেত্র। এক্ষণে সমগ্র বঙ্গে কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক নরনারী এই সাংঘাতিক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

ওলাউঠা রোগের "কমাবেসিলাস্" টাইফয়েড জীবাণুর ন্যায় সাধারণতঃ জল ও দুগ্ধের সহিত মানব-দেহে প্রবিষ্ট হয়*। মনুষ্যের পাকস্থলী সুস্থ থাকিলে এই উদ্ভিজ্জাণু অনেক সময় বিনষ্ট হইয়া যায়। পাকস্থলীর অম্লরসের প্রভাব ইহারা সহ্য করিতে পারে না। যে কোন কারণে মনুষ্যের স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে এই উদ্ভিজ্জাণু দেহাভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করিয়া রোগানয়ন করে।

ওলাউঠা রোগীর মললিপ্ত বস্ত্রাদি যে পুষ্করিণীতে ধৌত করা হয়, সেই পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিয়া এক এক সময়ে এক

*উদরাময়, আমাশয়, প্রভৃতি রোগের বীজাণুও বারি সহায়ে মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়।

একটি পল্লী জনশূন্য হইয়া যায়। অনেক সময় এতদ্দেশীয় গোপ-নন্দনেরা যেখানে সেখানে দুগ্ধপাত্র ধৌত করিয়া বা দুগ্ধে যে কোন স্থানের জল মিশ্রিত করিয়া এই সকল রোগ-বীজাণু সংগ্রহ করে ও খরিদ্দারগণের মধ্যে রোগ বিস্তারের হেতুভূত হইয়া থাকে।

রোগবীজ-সম্বলিত জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালিত করিলে অথবা উহাতে বাসন মাজিলে জলবাসী জীবাণুগণ আমাদের দেহ-প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ পায়। এই সকল রোগ-জীবাণু বহির্জগতে ও ভূমধ্যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে। কোন একটি মজা নদীর সান্নিধ্যে এক সমাধিক্ষেত্র ছিল। ঐ স্থানে অনেক সময় ওলাউঠা রোগীর মৃত দেহও কবর দেওয়া হয়। কালক্রমে ঐ ভূখণ্ড নদীগর্ভে পতিত হইলে জল দূষিত হইয়া পড়ে। নদীর তৎকূলবর্ত্তী জনগণ ঐ জল ব্যবহার করিয়া ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। স্বাস্থ্যবিধি মতে এইজন্য হিন্দুর দাহ প্রথা প্রশংসনীয়। আর্য্যমনীষিগণ অনেক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এই সকল সুনিয়ম করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ-দিগের মধ্যে এখন অনেকেই দাহ প্রথার পক্ষপাতী। মৃতদেহ দাহ করিলে আশ্রয় ও আশ্রিত উভয়ই যুগপৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়। সংক্রামক রোগে মৃত্যু হইলে যদি কবর দিতে হয়, তবে চূণের দ্বারা শবদেহ আবৃত করিয়া কবর দেওয়াই সুব্যবস্থা।

টাইফয়েড ও ওলাউঠা রোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সকল প্রকার খাদ্যের বিশেষতঃ পানীয় জলের বিশুদ্ধতার

প্রতি লক্ষ্য রাখাই প্রধান আবশ্যক। আমাদের দেশবাসিগণের এতদ্বিষয়ে জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে তাহারা যে জল পান করে, সেই জলেই আবার রোগীর মল-মূত্র সিক্ত শয্যা বসনাদি ধৌত করিতে ভীত হয় না। তাহারা এই বিষতুল্য জল পান করিয়া সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করিবে, তথাচ পানীয় জল দূষিত করিতে পশ্চাৎপদ নহে। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা জলের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন "আপো নারায়ণঃ স্বয়ম্।" হিন্দুশাস্ত্রে জলকে দেবতাজ্ঞানে অর্চ্চনা করিবার কথা বহু স্থানে লিখিত আছে। মহাভারতে উক্ত আছে—"উভে মূত্রপুরীষে তু নাপ্সু কুর্য্যাৎ কদাচন"—অর্থাৎ জলে কদাচ মূত্র পুরীষাদি ত্যাগ করিবে না। আমরা এই সকল কথা এখন বাতুলের উক্তি মনে করিয়া মান্য করি না। ইংরাজ কবি পোপ যথার্থ বলিয়াছেন—

"We think our fathers fools, so wise we grow;
our wiser sons, no doubt, will think us so."

আমাদের দেশের অনেক ধর্ম্মধ্বজী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অবগাহন কালে পরিত্যক্ত কাস হস্ততালুতে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরে সেই হস্ত জলে ধৌত করিয়া ফেলেন। ব্যবহারাজীব যেমন আইনের কূট তর্কের দ্বারা অপরাধীকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হ'ন, এই সকল ধর্ম্মময় পুরুষ তেমনই শাস্ত্রানুশাসন এতদ্ভাবে পালন করিয়াও অসার তর্কের দ্বারা আপনাদিগকে নিষ্পাপ প্রতিপন্ন করেন। উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কার্য্য করিলে

কোন ফলোদয় হয় না। শাস্ত্রে জলকে কেন দেবতা বলা হইয়াছে তাহার সত্য তথ্য যে দিন দেশবাসী ভাল করিয়া বুঝিবে, সেই দিন হইতে চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশের তালিকায় আসামী—সংখ্যাও অনেক হ্রাস হইয়া পড়িবে।

সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবকালে যথাসম্ভব স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে সচেষ্ট থাকিবে। দুশ্চিন্তা, দুষ্পাচ্য দ্রব্য আহার, রাত্রি জাগরণ, শীতাতপ সেবন, ভয়, অত্যধিক পরিশ্রম প্রভৃতি স্বাস্থ্যহানিকর কারণ গুলি সর্ব্বথা পরিহার্য্য। এই সময়ে শূন্যোদরে অধিকক্ষণ থাকিতে নাই। পাকস্থলী খাদ্যপূর্ণ থাকিলে অম্লরস নিঃসরণ হইতে থাকে; সুতরাং তৎকালে অল্পসংখ্যক রোগ-জীবাণু উদরস্থ হইলেও অম্লরসের প্রভাবে তাহারা গতাসু হইয়া পড়ে।

গ্রামে টাইফয়েড বা কলেরা রোগ প্রাদুর্ভূত হইলে যাহাতে রোগ-বীজ নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে গ্রামবাসিগণ বিশেষ মনোযোগী হইবে।

যে সকল খাদ্যসামগ্রী না রাঁধিয়া আহার করা চলে, তাহা বাজার হইতে বাড়ীতে আনিবে না। দোকানের প্রস্তুত পাণ কখনই ব্যবহার করিবে না। অনেক সময় তাম্বুল বিক্রেতা তাম্বুলের সহিত যে জল ব্যবহার করে তদ্দ্বারাই রোগ-বীজাণু আমাদের দেহে সংক্রামিত হয়।

খাদ্যদ্রব্যে মক্ষিকা বসিতে দিবে না। মক্ষিকাগণ নানা

দিক্‌দেশ হইতে কলেরা ও আর আর অনেক রোগের বীজাণু বহন করিয়া আনে।

ধূলিকণার সহিতও এই সকল রোগ-বীজ উড়িয়া বেড়ায়। অতএব খাদ্যে ধূলিকণার সংস্পর্শ না হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিবে।

হস্ত রীতিমত ধৌত না করিয়া খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিও না। দন্তের দ্বারা নখ কাটা বা পুনঃ পুনঃ মুখে হাত দিয়া অঙ্গুলিতে থুতু লাগাইয়া পুস্তকের পাতা উল্‌টান প্রভৃতি কুঅভ্যাস ত্যাগ করিবে। এক সময়ে কলিকাতার কোন এক সরকারি চিকিৎসালয়ে হঠাৎ কয়েকজন ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়। কোথা হইতে কি ভাবে এই বীজ হাঁসপাতালে প্রবেশ করিল তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া তত্রত্য প্রথিতনামা চিকিৎসকগণ দেখিলেন যে এক ভৃত্যের হস্তে ওলাউঠার উদ্ভিজ্জাণু সংযুক্ত ছিল। অনেক সময় এইরূপ অলক্ষিতভাবে রোগ-বীজ দেশান্তর হইতে রোগ-শূন্য দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। একদা বিহারের পাটনা সহরে ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। দানাপুরের সেনানিবাসে যাহাতে পাটনার কোন দ্রব্য বা নরনারী প্রবেশ করিতে না পারে তৎপক্ষে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এক নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন। একদিন মলিন বসনাবৃত জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি ঐ স্থানে ভিক্ষা করিতে আসিলে সেনানিবাসের দ্বাররক্ষী তাহার গলদেশে হস্ত প্রদান করিয়া তাড়াইয়া দিল। এই ঘটনার পরদিনই সেই রক্ষী সৈন্যের

ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ভিক্ষুকের মলিন বসনে কোথা হইতে কি প্রকারে রোগ-বীজাণু লিপ্ত হয়। পরে ঐ বীজ সৈনিকের হস্তে লাগিয়াই এই অনর্থ ঘটাইয়াছে।

বাজারের যে কোন স্থানের সোডা, লেমনেড প্রভৃতি পানীয় পান করিবে না। উহা বিশ্বস্ত কারখানায় প্রস্তুত হওয়া চাই। দূষিত জলে প্রস্তুত সোডা লেমনেড পান করিয়া সংক্রামক রোগ হইতে শুনা গিয়াছে।

আহার্য্য সামগ্রী সকল সময়েই গরম গরম ভক্ষণ করিবে। লবণ বা অন্য কোন বস্তু মাটীতে রাখিয়া খাইবে না। পানীয় জল-পাত্র কখন অনাবৃত রাখিও না। উহার মধ্যে ঘটী, গেলাস বা অপর কোন ক্ষুদ্র পাত্র ডুবাইয়া জল তুলিবে না।

রোগের প্রাদুর্ভাবকালে নিজের রক্ষিত পুষ্করিণী বা কূপের জল ব্যতীত বাহিরের জল ব্যবহার করিবে না। অবিশুদ্ধ জলে বাসন মাজিয়া তাহাতে খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করিলেও অনেক সময় অলক্ষিতভাবে রোগ-বীজ উদরস্থ হয়। পুষ্করিণী বা কূপের জলের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে ঐ জল রীতিমত সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে বাধা নাই। আমরা ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ পুষ্করিণী বা কূপ সংশোধন করিয়া লইতে পারি। অবশ্য এই উপায়ে জল শোধন করা কিছু ব্যয় সাধ্য। একটি পরিষ্কৃত পাত্রে পারমাঙ্গা-নেট্-অব্-পটাস্ (Permanganate of Potass) গুলিয়া পুষ্করিণী বা কূপের জলে ঢালিয়া দিতে হইবে। যতক্ষণ জলের রঙ্ অল্প বেগুনিয়া বর্ণ না হয় ততক্ষণ

অল্প অল্প গুলিয়া ঢালিয়া দিবে। জলের রঙ্ অল্প বেগুনিয়া বর্ণ হইলে আর দিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপে শোধন করার পর দুই তিন দিবস ঐ জল ব্যবহার না করিলেই ভাল হয়। যদি নিতান্ত আবশ্যক হয় তবে ১২ ঘণ্টা পরে ব্যবহার করিতে পার। ইহাতে জল বিস্বাদ হয় না।

পারমাঙ্গা-নেট্-অব্-পটাস্ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। ইহা রক্তবর্ণ দানাবিশিষ্ট পদার্থ। সাধারণতঃ প্রত্যেক কূপ শোধন করিতে এই দ্রব্য অর্দ্ধ ছটাক হইতে এক ছটাক পর্য্যন্ত লাগিতে পারে।

গোয়ালার দুগ্ধ অথবা অপরিচিত জল পান করিতে হইলে রীতিমত না ফুটাইয়া কখনই ব্যবহার করিবে না। অনেকে মনে করেন, জল নির্ম্মল, স্বচ্ছ ও স্বাদু হইলেই উহা নিরাপদে পান করা যায়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। টাইফয়েড, কলেরা, অতিসার, আমাশয় প্রভৃতি রোগের বীজাণু জলের সহিত অল্প মিশ্রিত থাকিলে উহার বর্ণের বা স্বাদের কোন ব্যতিক্রম হয় না। আমরা এরূপ হতজ্ঞান হইয়াছি যে প্রত্যহ ষোড়শোপচারে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইতে পারি কিন্তু পানীয় জলটুকু ফুটাইয়া লইতে পারি না। ইহার ফলও ফলিতেছে। আমাদের "অন্ত্রে দন্তে" না দেওয়া সঞ্চিত ধন চিকিৎসকেরা লইতেছেন এবং প্রাণগুলি কলেরা, অতিসার, টাইফয়েডের উদর পূর্ণ করিতেছে। যদি এই সকল ব্যাধির গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে পানীয় জল ও দুগ্ধ রীতিমত

সুসিদ্ধ করিয়া পান কর। জল ঈষদুষ্ণ করিলে জলবাসী জীবাণুগণের মৃত্যু হয় না ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে।

বাড়ীতে টাইফয়েড বা কলেরা দেখা দিলে যাহাতে রোগ-বিস্তার না হয় তৎপক্ষে গৃহস্থ যত্নবান হইবে। রোগীর পরিচর্য্যাকারিগণ রীতিমত হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া খাদ্য গ্রহণ অথবা খাদ্যাদি প্রস্তুত করিবে না। রোগীর মল ও বমিত পদার্থাদি দ্বারা কলুষিত শয্যা বস্ত্রাদি দগ্ধ অথবা পল্লীর বহুদূরে যে স্থানে পুষ্করিণী, কূপ, নদী বা পয়ঃপ্রণালী নাই এমত স্থানে প্রোথিত করিতে হইবে। বাড়ী ঘর দ্বার সদা সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবে। পয়ঃপ্রণালী, পাইখানা প্রভৃতি স্থানগুলি প্রতিদিন দুই তিন বার ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিবে। কোন স্থানে তরকারীর খোসা, মাছ, মাংস বা ফেন ইত্যাদি পচিতে দিবে না। পানীয় জল ও দুগ্ধ উত্তমরূপে সুসিদ্ধ না করিয়া কখনই ব্যবহার করিবে না। বাড়ীর পূর্ব্ব সঞ্চিত জল পরিত্যাগ করিয়া জলাধারগুলি ফুটন্ত জলে ভিতর বাহির পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া লইবে। হস্ত মুখ প্রক্ষালনের জন্য যে জল আবশ্যক, তাহাও সুসিদ্ধ হওয়া উচিত। পানীয় জলটুকু সিদ্ধ করিলেই যথেষ্ট, এরূপ ধারণা রাখিও না। অনেক সময় গৃহস্থ সুসিদ্ধ জল পান করেন বটে কিন্তু ভাতে জল দিবার সময় কাঁচা জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব-কালে এইরূপ অপরিচিত জল-সিক্ত পান্তাভাত খাইয়া রোগা-ক্রান্ত হইতে শুনা গিয়াছে।

ভোজন পাত্রাদি সংস্কৃত করিয়া দুই তিন বার ফুটন্ত জলে ধৌত করিয়া লইবে। উহাদিগকে মাটীতে সাজাইয়া রাখিবে না ;—কোন উচ্চ স্থানে তুলিয়া রাখিবে।

রোগীর ঘরে কোন ভক্ষ্য বা পানীয় রক্ষা করা বা ঐ ঘরে বসিয়া কিছু আহার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

বাড়ীর সুস্থ জনগণ রোগীর কক্ষ হইতে অনেক দূরে ধূলি-মক্ষিকা পরিশূন্য এক পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া হস্ত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তপ্তজল-ধৌত বাসনে সুসিদ্ধ অন্ন-পানীয় গরম থাকিতে থাকিতে গ্রহণ করিবে এবং আহারান্তে সিদ্ধ জলে আচমন করিবে। এ সময়ে কোন দ্রব্যই সিদ্ধ না করিয়া খাইবে না। সকল সামগ্রী উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিবে।

মনে কোন প্রকার ভয় আসিতে দিবে না ; যাহাতে শরীর-মন সুস্থ থাকে তাহাই করিবে। জানিয়া রাখিও—আমাদের দেহে যে বিধি-দত্ত ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি আছে, শরীর ও মন ভগ্ন হইলে সে শক্তিও ক্ষুণ্ণ হয়। কাজে কাজেই তখন অতি সহজেই রোগ-বীজাণু আমাদিগকে পাতিত করিয়া ফেলে।

অনেকে কলেরা টাইফয়েড রোগীর পরিচর্য্যা করিতে শঙ্কা বোধ করেন। রোগী স্পর্শ করিলেই এই সকল রোগ হয় না। ভোজ্য পানীয়ের সহিত রোগ বীজাণু উদরস্থ না হইলে ভয়ের কোন কারণ নাই। ভোজ্য পানীয় বীজাণুশূন্য রাখিতে পারিলে, পান-ভোজনপাত্র পরিষ্কৃত রাখিলে এবং হস্ত পরিশোধক জলে

ধৌত করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিলে এই সকল রোগীর বমিত পদার্থ ও মূত্র-পুরীষ—যাহার সহিত রোগ-বীজাণু বহির্গত হয়—ঘাঁটিলেও কোন বিপদ্ হয় না।

কিছুদিন হইতে পণ্ডিত হ্যাফ্কিনের ওলাউঠা নিবারক টিকার পরীক্ষা চলিতেছে। উহা যদি সফল হয় তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই দেশ হইতে ওলাউঠা ভীতি দূর করিতে সমর্থ হইব। উক্ত মহাত্মা ওলাউঠা বিষ ক্ষীণ করিয়া লইয়া উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে অধস্ত্বাচীক রূপে (হাইপোডার্মিক) প্রয়োগ করেন। প্রথম বিষ প্রয়োগের পর দেহের উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হয়; শিরঃপীড়া এবং বিদ্ধ স্থানে অল্প বেদনা ও স্ফীতি দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ দিবসে বিষের অপেক্ষাকৃত উগ্রতর দ্রব দ্বিতীয়বার প্রবিষ্ট করান হয়। এ সময়েও শরীরের তাপাধিক্য ও স্থানীয় বেদনা প্রকাশ পায়; কিন্তু স্ফীতি দৃষ্ট হয় না। ঐ বেদনা তিন দিবসের অধিক থাকে না। উদরাময় বা কোন প্রকার পরিপাক বিকার উপস্থিত না হইয়া অনেকের ২৮ ঘণ্টার মধ্যেই অসুস্থাবস্থা তিরোহিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পুরুলিয়া ও সুলকিন্ "কুলি-নিবাসে" ২৩৮৮ জন শ্রমজীবীকে এই টিকা দেওয়া হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এই বৎসর তথায় ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব অল্পই দৃষ্ট হইয়াছিল। এক সময়ে কতিপয় পল্লীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ডাক্তার পাউয়েল্ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে টিকা হয় নাই এমন ৬৫৪৯ জনের মধ্যে ১৯৮ জন ওলাউঠা রোগে পীড়িত হয় এবং ১২৪ জন ভবলীলা সাঙ্গ করে।

অপর পক্ষে টিকা গ্রহণকারী ৫৭৭৮ জনের মধ্যে কেবলমাত্র ২৭ জন রোগাক্রান্ত এবং ১৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ের পীড়া ও মৃত্যুর হার সমান হইলে টিকাধারিগণের মধ্যে ২৭ জনের পরিবর্ত্তে ১৭৪ জন পীড়িত এবং ১৪ জনের পরিবর্ত্তে ১০৯ জন মৃত হইত। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে টিকাধারী অপেক্ষা টিকাবর্জ্জিত জন সাধারণের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুর হার প্রায় অষ্টগুণ অধিক। ওলাউঠার টিকা প্রচলিত হইলে শ্বেত ঋষি হ্যাফ্‌কিনের নাম জগদ্বাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বলেন যে, যে সকল লোক তাম্রখণ্ড নাড়াচাড়া করে বা তাম্রখনিতে কার্য্য করে তাহাদের প্রায় ওলাউঠা হয় না। তাঁহাদের মতে শরীরে পূর্ব্ব হইতে তাম্র ধারণ করিলে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই কথার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই বটে তবে হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে ইহার সুমীমাংসা হইতে পারে। সূর্য্যাদি গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইলেই আমাদের শরীরে রোগ প্রবিষ্ট হয়। কোন্ গ্রহ হইতে কোন্ ব্যাধির উৎপত্তি তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। রবি—হৃদ্‌কম্প, শিরঃপীড়া, সর্দ্দি-গর্ম্মী, ওলাউঠা, চক্ষু ও মুখ রোগকারক গ্রহ। এই দুষ্ট গ্রহ তুষ্ট থাকিলে মনুষ্যের ঐ সকল রোগ ভোগ করিতে হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"সূর্য্যাদি দোষশান্ত্যৈ বীর্য্যাণি ভুজেন তাম্র শঙ্খৌ চ।
বিদ্রুম কাঞ্চন মুক্তা রজত ত্রিপু লৌহ রাজ পট্টানি"॥

অতএব দেখা যাইতেছে, বাহুমূলে তাম্রধারণ করিলে সেই মানবের প্রতি সূর্য্যগ্রহ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কাজে কাজেই উপরি উক্ত গ্রহজ ব্যাধিগুলি আর হইতে পারে না। তাম্রই সূর্য্যের প্রিয় সামগ্রী। এই জন্য সূর্য্যপূজায় তাম্রপ্রতিমা ও তাম্রালঙ্কার আবশ্যক হয়। পূজান্তে গ্রহ-বিপ্রকে যে সকল সামগ্রী দান করিবার বিধি আছে তন্মধ্যেও "ঘৃত হেম তাম্রম্" পদের উল্লেখ দেখা যায়।

অনেকে গ্রহশান্তির কথায় বিশ্বাস না করিতে পারেন। এখনকার দিনে কেহ এ সকল কথা বলিলেও লোকে তাহাকে বাতুলালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তবে ইহা জানিয়া রাখিও—আর্য্যঋষিগণ যে সকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে কোন গূঢ় সত্য নিশ্চয়ই নিহিত আছে। অনেক স্থানে তাঁহারা প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া এক একটি বিষয়ের এক একটি বাহ্য কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। আজ লোক বিজ্ঞানালোকে তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থাগুলির রহস্য কিছু কিছু অনুভব করিতেছে। আপ্তোপদেশ গ্রহণ করিলে জীবের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই।

অপর পক্ষে টিকা গ্রহণকারী ৫৭৭৮ জনের মধ্যে কেবলমাত্র ২৭ জন রোগাক্রান্ত এবং ১৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ের পীড়া ও মৃত্যুর হার সমান হইলে টিকাধারিগণের মধ্যে ২৭ জনের পরিবর্ত্তে ১৭৪ জন পীড়িত এবং ১৪ জনের পরিবর্ত্তে ১০৯ জন মৃত হইত। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে টিকাধারী অপেক্ষা টিকাবর্জ্জিত জন সাধারণের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুর হার প্রায় অষ্টগুণ অধিক। ওলাউঠার টিকা প্রচলিত হইলে শ্বেত ঋষি হ্যাফ্কিনের নাম জগদ্বাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বলেন যে, যে সকল লোক তাম্রখণ্ড নাড়াচাড়া করে বা তাম্রখনিতে কার্য্য করে তাহাদের প্রায় ওলাউঠা হয় না। তাঁহাদের মতে শরীরে পূর্ব্ব হইতে তাম্র ধারণ করিলে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই কথার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই বটে তবে হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে ইহার সুমীমাংসা হইতে পারে। সূর্য্যাদি গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইলেই আমাদের শরীরে রোগ প্রবিষ্ট হয়। কোন্ গ্রহ হইতে কোন্ ব্যাধির উৎপত্তি তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। রবি—হৃদ্‌কম্প, শিরঃপীড়া, সর্দ্দি-গর্ম্মী, ওলাউঠা, চক্ষু ও মুখ রোগকারক গ্রহ। এই দুষ্ট গ্রহ তুষ্ট থাকিলে মনুষ্যের ঐ সকল রোগ ভোগ করিতে হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"সূর্য্যাদি দোষশান্ত্যে বীর্য্যাণি ভুজেন তাম্র শঙ্খৌ চ।
বিদ্রুম কাঞ্চন মুক্তা রজত ত্রিপু লৌহ রাজ পট্টানি"॥

অতএব দেখা যাইতেছে, বাহুমূলে তাম্রধারণ করিলে সেই মানবের প্রতি সূর্য্যগ্রহ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কাজে কাজেই উপরি উক্ত গ্রহজ ব্যাধিগুলি আর হইতে পারে না। তাম্রই সূর্য্যের প্রিয় সামগ্রী। এই জন্য সূর্য্যপূজায় তাম্রপ্রতিমা ও তাম্রালঙ্কার আবশ্যক হয়। পূজান্তে গ্রহ-বিপ্রকে যে সকল সামগ্রী দান করিবার বিধি আছে তন্মধ্যেও "ঘৃত হেম তাম্রম্" পদের উল্লেখ দেখা যায়।

অনেকে গ্রহশান্তির কথায় বিশ্বাস না করিতে পারেন। এখনকার দিনে কেহ এ সকল কথা বলিলেও লোকে তাহাকে বাতুলালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তবে ইহা জানিয়া রাখিও—আর্য্যঋষিগণ যে সকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে কোন গূঢ় সত্য নিশ্চয়ই নিহিত আছে। অনেক স্থানে তাঁহারা প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া এক একটি বিষয়ের এক একটি বাহ্য কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। আজ লোক বিজ্ঞানা-লোকে তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থাগুলির রহস্য কিছু কিছু অনুভব করিতেছে। আপ্তোপদেশ গ্রহণ করিলে জীবের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই।

প্লেগ বা মহামারী।

কিছুদিন হইতে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রধান প্রধান সহরে প্লেগ-রোগের অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়িয়াছে। বল বিক্রমে এই ব্যাধি ওলাউঠা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। অনেকে মনে করেন, প্লেগ এতদ্দেশে নবাগত; কিন্তু সে ধারণা ভ্রমাত্মক: এই রোগ হিন্দুস্থানে পূর্ব্ব পরিচিত। সেকালে লোক ইহাকে মহামারী বলিত। পুরাবৃত্ত লেখকগণ বলেন মিসরের কাইরো নগরই ইহার আদিস্থান। এই জনবহুল অস্বাস্থ্যকর সহরে উহা উৎপন্ন হইয়া ক্রমে জগদ্ব্যাপী হইয়া পড়ে। কাইরো নগরের রাজপথগুলি তখন অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল। তথাকার অধিবাসিগণও নিতান্ত মলিনভাবে বসতি করিত। নাইল নদীর একটি শাখা এই সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। বৎসরের কোন কোন সময়ে ঐ শাখা-নদীটি প্রায় জলশূন্য হইয়া থাকিত। তখন নাগরিকগণ গ্রাম্য-জঞ্জাল ও গো-মেষাদির মৃতদেহ ইহার গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিতে ইতস্ততঃ করিত না। এই প্রক্ষিপ্ত আবর্জ্জনারাশির পূতিগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিলে সহরে প্লেগ আসিয়া দেখা দিত। কিন্তু নাইলের জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাখা-নদীটি আবার খরস্রোতা হইলেই এই সাংঘাতিক ব্যাধি অদৃশ্য হইত। যে সকল

বিগলিত জীবের দেহোৎপন্ন দুর্গন্ধ প্লেগ-রোগকে আহ্বান করে বলিয়া প্রাচীন মিসরবাসীদের মনে ধারণা ছিল, সেই সকল জীবের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য দেশের লোক সমবেত হইয়া শকুনিজাতীয় এক প্রকার পক্ষীর আরাধনা করিত।

খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই রোগে এথেন্স নগরে এত লোকক্ষয় হইয়াছিল যে মহামাংসভুক্ শৃগাল কুক্কুরেও শব-দেহ স্পর্শ করে নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মহামারী য়ুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশগুলিকে বিশেষভাবে বিধ্বস্ত করে। ইহার আক্রমণে এক য়ুরোপের ২৫০০০০০০ সন্তান বিনষ্ট হয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষম ব্যাধি যখন উগ্রমূর্ত্তিতে ইংলণ্ডে প্রবেশ করে, তখন লণ্ডন সহরের অধিবাসি-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ইহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

প্রাচীন কাল হইতে হিমাদ্রি প্রদেশের অনেক স্থানে প্লেগ গমনাগমন করিতেছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে ১৬১১ হইতে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীর, আগ্রা প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে মহামারীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে। তৎকালে নগরবাসিগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রান্তরে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিয়াছিল। ইহার উৎপাতে স্বয়ং দিল্লীশ্বর আগ্রা হইতে আহম্মাদাবাদ সহরে পলায়ন করেন; কিন্তু ঐ স্থানও নিরাপদ্ ছিল না। সম্রাট্ যখন দেখিলেন তাঁহার পক্ষে এই নব নির্ব্বাচিত স্থানও নির্ব্বিশঙ্ক নহে তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া

এই দেশকে "বেমারিস্থান" অর্থাৎ রোগ-নিবাস বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এক সময়ে লাহোরে ইহার আক্রমণে এত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল যে শবদেহের পূতিগন্ধে অবশিষ্ট লোক ঘরের বাহির হইতে পারে নাই। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বারহান্‌পুরে ইহার প্রকট মূর্ত্তির কথা মনে পড়িলে অদ্যাবধি লোকের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। ইহার আগমনে সম্রাট্ বাহাদুর শাহের সেনা-নিবাস দেখিতে দেখিতে শব-নিবাসে পরিণত হইয়া পড়ে। একদিকে শিবির-শ্রেণী এবং অপর দিকে অসংখ্য সমাধিস্তূপ, এই লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া মনুষ্যমাত্রই ভীত, চকিত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে তিন ক্রোশ দূরে একটি শবদেহ স্থানান্তরিত করিতে প্রতি বাহককে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতেও লোকে কাতর হয় নাই। ১৮১২ হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্লেগ কচ্ছদেশে বিষম উৎপাত করে। তৎকালে যাহাতে এই রোগ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত না হয়, সে পক্ষে যত্নের ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু কুটিল ব্যাধি সকল চেষ্টা যত্নকে উপেক্ষা করিয়া সগর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ আক্রমণ করিয়াছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোর সহরে ইহার তাণ্ডবলীলা তদ্দেশ-বাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮৯৬ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে ইহা দ্বারা সমগ্র ভারতে মোট ৫৩০৫০০ লোকের মৃত্যু হয়; কিন্তু তন্মধ্যে ৩৭৬৩০০ জন কেবল বোম্বাই প্রদেশবাসী।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন প্লেগ-রোগ কলিকাতা মহানগরীতে নবপ্রবেশ করে তখন ঐ জনকোলাহল মুখরিত স্থানের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা কে না বিদিত আছেন? এই ব্যাধি-শত্রু কর্ত্তৃক রাজধানী আক্রান্ত হইলে বাদশাহ নিজ অমূল্য জীবন রক্ষার আগ্রহ জন্য স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোম্বাই ও কলিকাতা—এই ধনজনসৌধপুরী দুইটি—যখন প্লেগের দৌরাত্ম্যে প্রকম্পিত, তখন কর্ত্তব্যপরায়ণ লর্ড স্যাণ্ড্-হার্ষ্ট ও মহামতি সার্ জন্ উডবরণ্ প্রভৃতি প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা নশ্বর জীবনের মায়া মমতা পরিহার করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়া রোগ দূর করিবার বিহিত ব্যবস্থা ও নাগরিকগণকে অশেষ সান্ত্বনা প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই স্থানেই ইংরাজের মহত্ত্ব।

এই ব্যাধির নিদান নির্ণয়ের জন্য অনেক কাল হইতে নানা চেষ্টা হইতেছিল; কিন্তু সে সকল ফলপ্রসূ হয় নাই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন এই দুরন্ত ব্যাধি হংকং নগর আক্রমণ করে, তখন জাপানী বৈজ্ঞানিক কিটাসাটো প্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত অনেক গবেষণা দ্বারা স্থির করিলেন যে এক প্রকার জীবাণুই এই রোগের কারণ। ঐ জীবাণুর নাম "বেসিলাস্ পেস্‌টিস্" (Bacillus Pestis)।

প্লেগ-জীবাণু কিরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়, তদ্বিষয়ে চিকিৎসকগণের মধ্যে মতভেদ ছিল। কেহ কেহ বলিতেন মূষিকই ইহার বাহন। অপর সম্প্রদায় এই

মতের পরিপন্থী। তাঁহাদের মতে গণপতি বাহনের সহিত এই রোগের সম্বন্ধ আছে বটে কিন্তু মূষিক কর্তৃক ইহারা অন্য স্থানে নীত হয় না।

প্লেগ-জীবাণু ভূগর্ভে বাস করে। মূষিকগণ সর্ব্বপ্রথমে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মূষিকদেহে এক প্রকার রক্তপায়ী ক্ষুদ্র মক্ষিকা (Rat flea) বসতি করে। প্লেগাক্রান্ত মূষিকের রক্ত পান করিয়া ঐ মক্ষিকাগণ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তখন তাহারা যে মনুষ্যকে দংশন করে তাহার প্লেগ-রোগ হইয়া থাকে। এইরূপে মূষিক-দেহ-বাসী ক্ষুদ্র মক্ষিকা বিশেষের দ্বারা প্লেগ-বীজাণু মানবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়। শেষোক্ত মতই অধুনা পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে*।

পুনা সহরে প্লেগের প্রাদুর্ভাবকালে এই বিষয়ের উত্তম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। যে কয়েকটি গৃহে প্লেগ প্রথম প্রবেশ করে, সে গুলি শীঘ্রই জনশূন্য হইয়া পড়িল। ঐ সকল গৃহবাসী মূষিকগণও ইতঃপূর্ব্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও প্লেগের পরিব্যাপ্তি নষ্ট হয় নাই। তখন চিকিৎসকগণ কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন মূষিক-দেহবাসী ক্ষুদ্র মক্ষিকা সকল প্লেগ-দুষ্ট স্থানে উড়িয়া

*কেহ কেহ বলেন ইন্দুর-মক্ষিকাগণ দংশন করিয়া এই রোগের জীবাণু নিক্ষেপ করে না। তাহারা দংশনকালে তৎস্থানে মলত্যাগ করে। ঐ মলের সহিত জীবাণু নির্গত হয়।

বেড়াইতেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ক্ষুদ্র দেহাভ্যন্তরে প্লেগ জীবাণু পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালের লোকেরাও মুষিকের সহিত মহামারীর সম্বন্ধ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত। এক সময়ে ইহুদিদিগের "ঈশ্বরের সিন্দুক" নামক পূজ্য বস্তু পালেষ্টিনের লোকেরা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই পালেষ্টিনে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন ধর্ম্মযাজক ও মন্ত্রজ্ঞগণ দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন—"ইহুদিদিগের পূজ্য বস্তু ফিরাইয়া দাও এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ঐ সঙ্গে তাহাদিগকে পঞ্চ স্বর্ণ মুষিক ও পঞ্চ হিরণ্ময় অর্ব্বুদ প্রদান কর"।

"They answered, Five golden emerods, and five golden mice, according to the numbers of the lords of the Philistines : for one plague was on you all and on your lords.

I. Samuel VI.

প্লেগ-জীবাণু দেহাভ্যন্তরে পাঁচ ছয় দিবস গুপ্তাবস্থায় থাকিয়া রোগ আনয়ন করে। ডাক্তার ইয়ারসিন্ বলেন, যে কোন উপায়ে এই ভীষণ জীবাণু দেহ-প্রবিষ্ট হইলেই মনুষ্যের আর নিস্তার নাই। বস্ত্রাদি সংযোগে অথবা ধূলিকণার সহিত এই জীবাণু স্থানান্তরে গমন করিতে পারে। পণ্ডিত কিটাসাটো পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রখর রৌদ্রে, কার্ব্বলিক

লোশনে এবং চূণের জলে এই জীবাণু ক্ষণকাল মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ ভেদে এই রোগ চারি ভাগে বিভক্ত; যথা— বিউবোনিক, নিউমোনিক, সেপ্টিসিমিক ও ইণ্টেষ্টাইনাল টাইপ্। এই রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ৯০ অপেক্ষাও অধিক।

নিউমোনিক-প্লেগ অত্যন্ত সংক্রামক। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস ও শ্লেষ্মার সহিত এই রোগ-জীবাণু বহির্গত হয়। সুতরাং এই সকল রোগীর পরিচর্য্যাকারিগণের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। রণকেশরী নেপোলিয়ন যখন বিরাট বাহিনী লইয়া সিরিয়া প্রদেশে অভিযান করেন তখন তাঁহার সেনা-দলের মধ্যে অনেকে নিউমোনিক প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। নির্ভীক-হৃদয়ে বোনাপার্ট ঐ সমস্ত পীড়িত সৈন্যকে স্বয়ং দেখিতে যাইতেন; কিন্তু তিনি সকলকে এই উপদেশ দিতেন যে এমত দূরে থাকিয়া রোগীর সহিত বাক্যালাপ করিবে যেন তাহার পরিত্যক্ত প্রশ্বাস বা শ্লেষ্মা তোমার মুখ স্পর্শ করিতে না পারে।

কদন্নভোজন, বাতালোকহীন আর্দ্র ও জনাকীর্ণ স্থানে বাস, অপরিষ্কৃত বেশভূষা, দুর্গন্ধ ভোগ, শীত সেবা প্রভৃতি এই রোগের গৌণ কারণ। পণ্ডিতগণ বলেন—"It is a disease of filth, a disease of dirt and a disease of poverty."

যে য়ুরোপ একদিন এই রোগের আকর ছিল, আজ তথায় প্লেগের প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান কালে

বিজ্ঞানানুমোদিত স্বাস্থ্যোন্নতিকর পথাবলম্বনে য়ুরোপের জনপদগুলি রচিত হইয়াছে। তুরস্ক ও রুসিয়ার কোন কোন নগর এখনও পূর্ব্ববৎ অস্বাস্থ্যকর আছে। এই জন্য ঐ সকল স্থানে প্লেগের গতায়াত আজও অবরুদ্ধ হয় নাই। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে এক ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। তৎকালে ১৩০০০ সহস্র গৃহ ও ৮৯টি ভজনালয় একবারে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। এই দুর্ঘটনার পর স্বাস্থ্যবিধিমতে ঐ নগর নবনির্ম্মিত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের পর বৎসর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই উন্নত সহরে কখন প্লেগ হইতে শুনা যায় নাই। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান নগরগুলি স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ বিবুধজনের মনোজ্ঞ নহে। নাগরিকগণও স্বাস্থ্যরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন। নিবিড় লোকারণ্য কলিকাতার মধ্যে বড়বাজার প্রভৃতি কতিপয় পল্লী সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যবাসের অযোগ্য, গৃহস্থের বাড়ীগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে তন্মধ্যে বাতালোক প্রবেশের উপায় নাই। এক একটি অপ্রশস্ত পথে কখন সূর্য্য কিরণ পতিত হয় না ;— তাহারা চিরদিনই অসূর্য্যম্পশ্য রহিয়াছে। জনগহন বোম্বাই সহরেও গলিপথ বিরল নহে। তথায় কোন কোন বাড়ীতে আবার সহস্রাধিক লোক নাকি এক সঙ্গে বসতি করে। কাশী, এলাহাবাদ, কাণপুর, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি ভারতীয় সহরের মধ্যে নিবাত, নিষ্প্রভ স্থানের অপ্রাচুর্য্য নাই। পশ্চিমদেশীয় ভদ্রলোকদিগের অনেক বাড়ী এমতভাবে প্রস্তুত যে, একটিমাত্র দ্বার ভিন্ন গৃহাভ্যন্তরে বায়ু প্রবিষ্ট হইবার দ্বিতীয়

পন্থা দেখা যায় না। ইহার উপরে নগরের কলকারখানাগুলি আবার ধূমোদ্গীরণ করিয়া অবিরত বায়ু দূষিত করিতেছে; সুতরাং প্লেগ বলিয়া কেন, এই সকল দোষবহুল সহরে সকল রোগই অজ্ঞাতবাস করিতে পারে।

প্লেগ সংক্রামক ব্যাধি; কিন্তু তাহা বলিয়া রোগীকে স্পর্শ করিলেই প্লেগ হয় না। সাধারণতঃ ইন্দুর-মক্ষিকার (Rat flea) দংশন দ্বারাই এই রোগবীজ মানব-দেহে প্রবিষ্ট হয়। তবে শরীরে কোন প্রকার ক্ষত থাকিলে প্লেগ-রোগীর গৃহে না যাওয়াই সমীচীন। বাড়ীর কাহারও প্লেগ হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ এক পৃথক ঘরে রাখা উচিত। শুশ্রূষাকারিগণ হস্ত ও পরিধেয় বসনাদি উত্তমরূপে পরিশোধক জলে ধৌত করিয়া অন্ন-পানাদি গ্রহণ করিবে। সংক্রামক রোগীর পরিচর্য্যাকারী যে সকল সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য, ইহাতেও সেই সকল নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য।

নিউমোনিক-প্লেগাক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শ যত কম হয় ততই মঙ্গল। ঐ রোগীর পরিত্যক্ত প্রশ্বাস বা শ্লেষ্মা মুখে লাগিলে প্লেগ হওয়া অসম্ভব নহে। অবস্থায় কুলাইলে বাড়ীর সুস্থ জনগণকে স্থানান্তরে পাঠানই সুব্যবস্থা। রোগীর কক্ষে যাহাতে যথেস্ট পরিমাণে বাতালোক প্রবেশ করে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তির কফ, কাস, মূত্র, পুরীষাদি যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়, তৎস্থান অবিলম্বে ফেনাইল অথবা কার্ব্বলিক লোশন দ্বারা ধৌত করিবে। কলেরা—

টাইফয়েড রোগীর বস্ত্রাদির ন্যায় প্লেগ-রোগীর সমল শয্যাবসনাদি অবিলম্বে দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। ঘরে মধ্যে মধ্যে গন্ধক, অগুরু, লোবান প্রভৃতি পুড়াইলে ভাল হয়। গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুতে যে সকল রোগ-বীজাণু ভাসমান থাকে, এতদ্দারা সেগুলি বিনষ্ট হইতে পারে।

রোগীর গৃহে অধিক লোক থাকা নিষিদ্ধ। কিন্তু এ সুনিয়ম আমাদের সমাজের নিকট সর্ব্বথা অনাদৃত। এ দেশে কাহারও কোন পীড়া হইলে রোগীর স্বজন বান্ধব হইতে প্রতিবেশী গ্রাম-বাসী পর্য্যন্ত সকলেই দিবানিশি তাহাকে দেখিতে আসিয়া থাকেন। এই সময় কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণের স্বরতরঙ্গে রোগী-নিবাস মুখরিত হইয়া উঠে। লোকলোচনে ইহা আপাততঃ মধুময় হইলেও জ্ঞান-দৃষ্টিতে ইহা বিষতুল্য। গৃহজনতা আদৌ ব্যাধিত-জন মনোরঞ্জক নহে। বন্ধুবর্গের উপর্য্যুপরি প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া রোগী বিনিদ্র-নয়নে কাল কাটাইতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা স্থানীয় বায়ু অধিকতর দূষিত হইয়া পড়ে। অব্যাহত বিশ্রামই রোগাপনোদনের প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা ভালবাসার খাতিরে সেই সর্ব্ববাদিসম্মত হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া রোগীর রোগবৃদ্ধির হেতুভূত হইয়া থাকি ; কোন কোন মায়াবিনী রমণী সজ্ঞান রোগীর সম্মুখেই আবার অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। ইহাতে রোগীর মনে মরণ-ত্রাস উপস্থিত হইয়া হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ যে অভিনব ব্যাধি আনয়ন করে তাহা মন্ত্রৌষধির অসাধ্য। "বিষাদো রোগ বর্দ্ধকানাং"—

ইহাই চারকীয় নীতি। রোগবর্দ্ধক নিদানসমূহের মধ্যে বিষাদই (Depr-ssion) শ্রেষ্ঠতম। অনেক সময়ে সমাগত জনসঙ্ঘ দ্বারা নানা দিগ্দেশে রোগব্যাপ্তির পথ সুগম হয়। দেশবাসীর জ্ঞানচক্ষুরুন্মেষিত হইলে এই মন্দ প্রথার সহজেই তিরোধান হইতে পারে।

প্লেগ-রোগীর শবদেহ দাহ করাই প্রশস্ত; যেহেতু কবর দিলে রোগ বিস্তারের পথ সুগম হইতে পারে। যে গৃহে রোগী বাস করে তাহা পরিশোধক জলে ধৌত করত চূণকাম করিয়া ব্যবহার করিবে। কাঁচা ঘর হইলে অগ্নিদাহে সকল আপদ্ দূর হয়।

প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তি নিরাময় হইলেও মাসাধিক কাল তাহাকে সুস্থ সঙ্গে আসিতে দেওয়া অনুচিত; পরিচর্য্যাকারিগণকেও দশ দিবস পৃথক বাস করাইলে দেশের ও দশের সুমঙ্গল হইতে পারে।

পল্লীর কোন বাড়ীতে প্লেগ হইলে তথায় গতায়াত করা অনুচিত। অধিকন্তু সম্ভব হইলে স্থান ত্যাগই প্রশস্ত। এই সময়ে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি প্রতিপালন করা অত্যাবশ্যক। খাদ্য-পানীয়ের বিশুদ্ধতার প্রতি সর্ব্বদাই খরদৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভোজ্য সামগ্রীতে মক্ষিকা বসিলে অথবা পীড়িত মূষিকের মলসংযুক্ত থাকিলে ভোক্তার প্লেগ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। প্লেগ-দুষ্ট স্থান হইতে আনীত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবে না। ইন্দুর-মক্ষিকাগণ ঐ সকল সামগ্রী সম্ভারের সহিত স্থানান্তরে

নীত হয়। শয্যা বসনাদি প্রত্যহ রৌদ্রতপ্ত করা ভাল। দুগ্ধ ও জল সুসিদ্ধ না করিয়া কদাচ পান করা উচিত নহে।

রোগের প্রাদুর্ভাবকালে আর্দ্র মৃত্তিকায় শয়ন ও নগ্নপদে বিচরণ উভয়ই সম্পূর্ণ অহিতকর। প্লেগ-জীবাণু পদলগ্ন হইয়া মানব-দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে। সুতরাং মোজা ও জুতা পরিহিত হইয়া ভ্রমণ করিলে অনেক সময় প্রাগুক্ত ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই রোগ নিম্নতল-বাসী অপরিষ্কৃত লোকদিগের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে। অতএব অবস্থায় কুলাইলে দ্বিতল অথবা ত্রিতলে বাস করাই সঙ্গত। বাড়ীর প্রত্যেক ঘর যাহাতে খট্‌খটে ও বাতালোকপূর্ণ থাকে তদ্বিষয়ে গৃহস্থ মনোযোগী হইবে। রবিকর-সংস্পৃষ্ট অবাধ-বাতসঞ্চার গৃহে প্লেগের অণুদেহী জীবগণ অত্যল্পকালও থাকিতে পারে না। আঁস্তাকুড়, পাইখানা ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি দুর্গন্ধময় স্থান সকল প্রত্যহ দুইবার ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিবে। মোটকথা, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিলে প্লেগ সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। "Cleanliness is health"— এই নীতিকথা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত। বাসগৃহে যাহাতে মূষিককুল আশ্রয় না পায় তদ্বিষয়ে সদা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শস্য ভাণ্ডার, চাউলের গুদাম প্রভৃতি যে সকল নিভৃত স্থানে মুষিকদল বাস করে, তথায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। ইন্দুর গতায়ুঃ হইলে তদ্দেহবাসী ক্ষুদ্র মক্ষিকাগণ আশ্রয় অন্বেষণে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে এবং যে

গৃহে মূষিকের বাস আছে তথায় গিয়া উপস্থিত হয়। বাড়ীতে মৃত ইন্দুর দেখিলে সর্ব্বাগ্রে তদুপরি কিঞ্চিৎ কেরোসিন্ তৈল ঢালিয়া দিয়া একটি কাষ্ঠের চিম্‌টা দ্বারা উহাকে উঠাইবে এবং দূরে একস্থানে তৃণাচ্ছাদিত করিয়া ঐ চিম্‌টাসহ উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। এই সঙ্গে যে স্থানে মৃতদেহ পতিত ছিল, তৎস্থানও ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিতে ভুলিবে না।

মূষিকগণ দিবালোকে গহ্বর হইতে বাহির হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে পঞ্চত্ব পাইলে বুঝিতে হইবে ঐ গৃহে প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে। এমত ক্ষেত্রে ঝটিতি আশ্রয় ত্যাগ করাই প্রশস্ত। এবম্বিধ দূষিত গৃহ, ঔষধ-জলে বিশোধিত ও চূণকাম করিয়া জনশূন্য অবস্থায় কিছুকাল উন্মুক্ত রাখিলে পুনর্ব্বাসোপ-যোগী হইতে পারে।

এই সকল অর্থগর্ভ শাস্ত্রানুশাসন শুনিয়া কেহ কেহ ঔদাস্যব্যঞ্জক সহাস্য আস্যে বলিয়া থাকেন—"অদৃষ্টে থাকিলেই রোগ হইবে; তাহার জন্য আবার এত পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা কি"? ইঁহাদের মতে মানুষমাত্রই ভাগ্যাধীন; সুতরাং সেই অলঙ্ঘনীয় ভাগ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া বৃথা হস্ত পদাদি চালনে ক্লান্ত হওয়া অপেক্ষা গ্রাম সংক্রামক রোগে রসাতলে যাইলেও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসিয়া সধূম-কলিকা-কিরীটিনী গড়গড়ার সেবা করাই বিধি। এই সকল জ্ঞান-গর্ব্বিত পুরুষসিংহের মনোবিকার দূর করিতে পারি আমার এমত শক্তি নাই। তবে ধূলি-মল-পরিশূন্য বাতালোকময় স্বর্গ-

তুল্য স্থানের অধিবাসী সুপরিচ্ছন্ন শ্বেতাঙ্গদিগের স্বাস্থ্যের সহিত, আবর্জ্জনারাশি পরিপূর্ণ দুর্গন্ধময় নরকনিন্দিত স্থানের অধিবাসী কৃষ্ণাঙ্গদিগের স্বাস্থ্যের তুলনা করিলে অদৃষ্টবাদীর মনের আঁধার ঘুচিতে পারে।

জনপদধ্বংসকারী বহুরূপী প্লেগ-রাক্ষসের কবল হইতে মনুষ্য-দিগকে রক্ষা করিবার জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বহুবিধ চেষ্টা করিতেছেন। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন পর্য্যাপ্ত তৈল মাখিলে এই রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। আবার কেহ কেহ ইগ্নেসিয়া নামক বৃক্ষ-বিশেষের বীজ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। আরমেনিয়ানগণ প্লেগের প্রাদুর্ভাবকালে এই বীজ বাহুমূলে ধারণ করিত। কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ সকল কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না। "এসিয়াটিক্ কোয়াটারলী রিভিউ" নামক পত্রে ডাক্তার গামপেল লবণকে এই রোগের প্রতিষেধক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম দেশবাসীর মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ লোক নিম্ব ভোজনের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন প্রত্যহ নিম্বপত্র খাইলে প্লেগ হয় না। লবণ ও নিম্বপত্র উভয়ই জীবাণুনাশক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আমাদের শরীরে যে সকল উপাদান আছে, লবণ তন্মধ্যে অন্যতম। লবণাভাব ঘটিলে রক্ত নিকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং দেহ রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ওলাউঠা রোগেও লবণ সুফলপ্রদ। গেবিলষ্ট্রীট্ চিকিৎসালয়ে কেবল

মাত্র লবণমিশ্র দ্বারা ওলাউঠা রোগীর চিকিৎসা করাতে এই রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ১৪ হইতে দেখা গিয়াছিল। উপরি উক্ত নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী দুইটির গুণাবলী স্মরণ করিলে উহাদিগকে প্লেগের প্রতিষেধক বলিয়া বিশ্বাস হয়। সকলেই ইচ্ছা করিলে এই অমূল্য ভেষজদ্বয়ের শক্তি পরীক্ষা করিতে পারেন।

কিছুদিন হইল প্লেগ-নিবারক এক প্রকার টিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদিও এই টিকার শক্তি মানব-দেহে অধিককাল স্থায়ী হয় না, তথাচ ইহা দ্বারা রোগের প্রাদুর্ভাবকালে অনায়াসে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের জনসাধারণ প্লেগের টিকা গ্রহণ করিতে ভীত হইয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। যে সকল ব্যক্তি প্লেগ-দুষ্ট-স্থানে বসতি করেন, অথবা প্লেগ-রোগীর শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে এই টিকা গ্রহণ করিবেন।

প্রথমতঃ মাংসের ক্বাথে প্লেগ-জীবাণু নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রক্রিয়া দ্বারা উহাদিগকে নির্জ্জীব করা হয়। পরে ঐ মৃত জীবাণু সম্বলিত ক্বাথ লইয়া টিকা দেওয়া হইয়া থাকে। এই টিকার রোগ-নিবারিণী শক্তি বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৮৯৭ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেজার ব্যানার মান (Major Bannerman I. M. S. Superintendent of the Plague Research Laboratory, Bombay.)

টিকার ফলাফল দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত সময়ে ইহা গ্রহণ করিলে রোগাক্রমণের ভয় ও মৃত্যু সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক কম থাকে। আশা করি, বহুদর্শী ডাক্তার ব্যানার মানের কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলেই এই নির্দ্দোষ টিকার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবেন।

যক্ষ্মা।

সংক্রামক ব্যাধিসমূহের মধ্যে যক্ষ্মা অন্যতম। রোগশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা রাজযক্ষ্মা উপাধি পাইয়াছে। কথিত আছে, দক্ষরাজের অভিশাপে চন্দ্রই প্রথমে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। দেব চিকিৎসক ধন্বন্তরির উপদেশানুসারে রোগ-শান্তির জন্য নিশাপতি দিবা যামিনী অঙ্কে এক শশক ধারণ করিয়া থাকিতেন। এই জন্যই চন্দ্রের আর একটি নাম শশাঙ্ক। কোন্ সময়ে এই রোগ মনুষ্য সমাজে প্রথম প্রবেশ করে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

মহাভারতীয় যুগে প্রমোদা-জন-মনোহারী ভূপতি বিচিত্রবীর্য্য মহিষী যুগলের সহিত নিরন্তর প্রমত্ত থাকিয়া যৌবনারম্ভেই যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। খৃষ্ট জন্মাইবার তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশবাসী পণ্ডিত হিপক্রিটিস্ তদীয় পুস্তকে এই রোগের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যদিগের সুপ্রাচীন চরক গ্রন্থেও ইহার বিশদ বিবরণ বিবৃত আছে। বর্ত্তমান কালে প্রতিবৎসর জগতে যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার সপ্তম অথবা অষ্টমাংশ—এই যক্ষ্মা রোগেই মরিয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বকালে পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে ইহার আধিপত্য অল্পই দৃষ্ট হইত। এখন আমাদের ভাগ্যদোষেই বল, অথবা কর্ম্ম-

দোষেই বল অনেক বাল-কিশোর-যুবা অনুদিন ইহার কবলে পড়িয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে হয়ত স্বাস্থ্যহানির সমুদয় কারণ দেশের জল বায়ুর স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সহিত সমমতাবলম্বী হইতে পারি না; আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আহার বিহারাদির সুবিধান দ্বারা স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়া শতাতীতজীবী হইয়া গিয়াছেন। আমরা সেই সকল মহাত্মার পদাঙ্কানুসরণে উদাসীন হইয়া অকালে কালাগ্নিতে জীবনকে আহুতি প্রদান করিতেছি। যদিও বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় জলবায়ু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে, তথাপি আমরা যে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের পিতৃ পিতামহগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিতেন, কায়িক পরিশ্রম করিতেন এবং ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেন। আমরা এ সকল কিছুই করি না। আমরা বেলা ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত শয্যায় পড়িয়া থাকি, দুই পদ হাঁটিতে হইলে ট্রাম গাড়ীর জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করি এবং আহার বিহার সম্বন্ধে কোন নিয়মাধীন থাকিতে চাহি না। দুর্ভোজন, দুরালাপ, দুরালস্য ও ইন্দ্রিয়ভোগবাসনাই এখন আমাদের নিত্যকর্ম্ম হইয়াছে।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

"যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্ মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছোনম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু" ॥

আমরা এই সকল অনুশাসন প্রলাপোক্তি মনে করিয়া মান্য করি না। হিন্দুশাস্ত্রে তিথি নক্ষত্রানুসারে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ বর্জ্জনের বিধি নিষেধ আছে। সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণের চিন্তাপ্রসূত সকল তত্ত্বই আজ এদেশবাসীর নিকট উপেক্ষণীয়। আমাদের কিসে কি হইতেছে কেমন করিয়া বলিব।

ক্ষয়কাস বীজাণু-ঘটিত ব্যাধি। ফুস্‌ফুসই এই রোগের শান্তিধাম; সুতরাং শরীরের অপরাপর যন্ত্র অপেক্ষা প্রাগুক্ত যন্ত্রটি উহাদের দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। রসগ্রন্থি, স্বরযন্ত্র, মেরুদণ্ড অন্ত্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শারীর-যন্ত্রেও ক্ষয়রোগ হইতে পারে। পাকস্থলী ও মাংসপেশীসমূহ ক্বচিৎ এই রোগে আক্রান্ত হয়। ঐ সকল স্থানের ক্ষয়রোগ প্রতিষেধক শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক।

পৃথিবীর সকল স্থানেই যক্ষ্মারোগের আধিপত্য আছে; তবে য়ূরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতালোকদীপ্ত মহাদেশে ইহার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব। অষ্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর মধ্যস্থিত দ্বীপসমূহে পূর্ব্বে এই রোগ ছিল না। অধুনা তদ্দেশ-বাসিগণ য়ূরোপীয়দিগের সহিত সাহচর্য্য করিয়া রোগ-পশরা স্বদেশে আমদানি করিয়াছে। যে সকল অসভ্য জাতি সভ্যতার বাগুরায় পড়িয়া বিপন্ন হয় নাই, তাহাদের প্রতি যক্ষ্মার অনুগ্রহ-দৃষ্টি অদ্যাপি অনেক কম আছে। একদা জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মেচ্‌নিকফ্ কোন্ দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব কি প্রকার তাহা

নিরূপণ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন যে, যে সকল জাতি সভ্য-দেশের যত উপকণ্ঠে বসতি করে তাহাদের মধ্যে এই কাল ব্যাধির আধিপত্য তত অধিক। পরন্তু যাহাদের দেশে অদ্যাবধি সভ্যতালোক প্রবেশ করে নাই তাহাদের দেহ যক্ষ্মা-বীজের পক্ষে অনুর্ব্বর ক্ষেত্র। ক্যাস্পিয়ন্ সমুদ্রকূলবর্ত্তী পল্লীসমূহের অধিবাসী অসভ্য কাল্মুখ (Kalmuk) জাতির মধ্যে যক্ষ্মা-রোগ হইতে দেখা যায় না। তবে যে সকল কাল্মুখ কর্ম্মোপলক্ষে সুসভ্য দেশে আসিয়া বসতি করে, তাহাদের মধ্যে এই রোগের অপ্রাচুর্য্য নাই। পূর্ব্বে মেদিরা দেশেও যক্ষ্মা-রোগ ছিল না। এখন অনেক ক্ষয়রোগী দেশান্তর হইতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এই স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করায় সংস্পর্শ দোষে মেদিরাবাসীর মধ্যেও যক্ষ্মা-রোগ প্রকাশ পাইতেছে। ভূতলবাসী অপেক্ষা উত্তুঙ্গ শৈলবাসিগণের ক্ষয়কাস অল্পই হইয়া থাকে। ইহার কারণ, সমতল স্থানস্থিত-ব্যক্তি অপেক্ষা তাহাদের সর্ব্বদাই গভীর শ্বাসগ্রহণ করিতে হয়; সুতরাং পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাসগ্রহণে শ্বাসযন্ত্রের গঠন সুদৃঢ় হইয়া উহাদের যান্ত্রিক-রোগ প্রবণতা বিনষ্ট হইয়া যায়। আমাদের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা আহ্নিকের মধ্যে যে প্রাণায়ামের বিধি আছে তদ্দারাও ফুস্ফুসদ্বয় পরিপুষ্ট ও বলীয়ান্ হইতে পারে। কিন্তু আমরা সভ্যতার উচ্চস্তরে আসীন হইয়া অনেকদিন হইতে ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত হইয়াছি। যে দুই দশজন অদ্যাবধি দয়া করিয়া এই যোগিজন কাম্য অনুষ্ঠানটি রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারাও সাংসারিক

জ্বালা-মালায় প্রপীড়িত হইয়া অশান্তমনে নাসিকায় হস্তপ্রদান পূর্ব্বক একবার মন্ত্র কয়েকটি উচ্চারণ করেন মাত্র। অধুনা বাঙ্গালাদেশের কত শত লোক প্রতি বৎসর এক যক্ষ্মা-রোগেই অকালে মহাপ্রয়াণ করিতেছে। যে দেশে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া বহিঃশৌচ সমাপনান্তে দেবোদ্দেশ্যে পুষ্পাচয়ন করিয়া বেড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে—যে দেশে ত্রিসন্ধ্যা প্রাণায়াম করিলে মানসিক, বাচিক ও কায়িক পাপ সকল বিনষ্ট হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস—যে দেশে দিবানিদ্রা মহাপাপ বলিয়া গণনীয়—যে দেশে মহাজনেরা ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন—যে দেশে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিয়া দার পরিগ্রহ করিবার বিধি আছে, সে দেশের লোক আয়ুষ্মান্ না হইবার কোন কারণ নাই। তথায় যক্ষ্মা-রোগের এতাদৃশ প্রভাব থাকা অনুচিত।

অতি প্রাচীনকালের জ্ঞানবৃদ্ধ বৈদ্যগণ যক্ষ্মা'কে সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করিতেন। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে,—

"জ্বরঃ কুষ্ঠঞ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দিরেব চ
* * * সংক্রামন্তি নরান্নরং"।

এই রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য পুরাকালে পাশ্চাত্যদেশে অনেক চেষ্টা হইয়াছে। সেল্‌সাস্, গ্যালেন্, বেলি প্রভৃতি সে কালের বিদ্বজ্জন সমাজের মুখপাত্রগণ ইহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভেলিমেন্ নামক জনৈক ফরাসী চিকিৎসক যক্ষ্মা-রোগীর পরিত্যক্ত কাস শশকদেহে

পিচকারি দ্বারা প্রবিষ্ট করান। ইহার ফলে ঐ সকল প্রাণী অত্যল্পকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু যক্ষ্মা-রোগীর কাসে এমন কি বিষ-পদার্থ আছে, যাহা অন্য জীবের দেহে প্রবিষ্ট হইলে রোগানয়ন করিতে পারে, সে সত্য তথ্য তৎকালে কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই ঘটনার কিছুকাল পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা কক্ অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন যে এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণুই এই রোগের নিদান। এই উদ্ভিজ্জাণুগুলির আকার দৈর্ঘ্যে $\frac{১}{১০০০০}$ ইঞ্চি এবং প্রস্থে $\frac{১}{৫০০০০}$ ইঞ্চি। ইহাদের কোন প্রকার বর্ণ বৈচিত্র বা গতি শক্তি নাই। প্রক্রিয়া দ্বারা ইহাদিগকে রঞ্জিত করিতে না পারিলে অণুবীক্ষণের সাহায্যেও আমরা উহাদিগকে নয়নগোচর করিতে পারি না। এই বীজাণুর দৈহিক আবরণ এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। ভেষজাদি সহজে এই বীজাণুর দেহপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং উহাদিগকে বিনাশ করা কৃচ্ছ্রসাধ্য।

বহির্জগতে যক্ষ্মার উদ্ভিজ্জাণু অনেককাল জীবিত থাকে। রোগীর শুষ্ক শ্লেষ্মার মধ্যে ইহাদিগকে দুই মাসেরও অধিককাল জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। জলে ও ভূগর্ভে ইহারা দীর্ঘকাল সজীব থাকে। এই অণুদেহী উদ্ভিজ্জনিচয়ের শরীর এতাদৃশ ক্লেশসহনশীল যে বরফের মধ্যে রাখিয়া দিলেও ইহারা সহজে গতায়ুঃ হয় না।

ক্ষয়কাসের বীজাণুর নাম "বেসিলাস্ টিউবার কিউলোসিস্। (Bacillus Tuberculosis)। ঐ বীজাণু ফুস্‌ফুস মধ্যে

প্রবিষ্ট হইয়া স্থানীয় উত্তেজনা উপস্থিত করে। পরে উত্তেজিত স্থানে গুটিকা বা "টিউবারকল্" জন্মিয়া থাকে। যক্ষ্মা-রোগের যে সকল লক্ষণ আছে, এই গুটিকার উৎপত্তিই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। যে সময় বীজাণুতত্ত্ব মানবের জ্ঞানাতীত ছিল তখন এই গুটিকা দেখিয়াই যক্ষ্ম-রোগ নির্ব্বাচিত হইত। ভিষক্শ্রেষ্ঠ ডাক্তার সিল্ভিয়াস্ সর্ব্বপ্রথমে এই গুটিকোৎপত্তির কথা জগদ্বাসীর জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন।

মানব ব্যতীত অন্য জীবেরও যক্ষ্মারোগ হইয়া থাকে। মানুষের অন্ত্রে যে ক্ষয়রোগ জন্মে, যক্ষ্মা-পীড়িত গবাদির মাংস-ভক্ষণ বা দুগ্ধপানই তাহার কারণ।

পাকযন্ত্রের ব্যাধিসমূহের বীজ যেমন মল ও বমিত পদার্থাদির সহিত নির্গত হয়, এই অসাধ্য ব্যাধির বীজও তেমনই রোগীর শ্লেষ্মার সহিত নির্গত হইয়া থাকে। যে জলে রোগীর কফ কাসাদি নিক্ষিপ্ত হয় অথবা কফ কাসাদি রক্ষা করিবার আধার ধৌত করা হয়, সেই জল পান করিয়া মনুষ্য এই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। যক্ষ্মা-রোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত থাকে এবং সচরাচর এই বিষাক্ত ধূলিকণা নিশ্বাসের সহিত দেহপ্রবিষ্ট হইয়াই রোগানয়ন করে*। টেপিনিয়র নামক জনৈক অনুসন্ধায়ী এক সময়ে

* সর্দ্দি, কাসি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকফ্ প্রভৃতি রোগের বীজাণুও ধূলিকণার সহিত মিশিয়া বায়ুদ্বারা আমাদের দেহমধ্যে চালিত হয়। আজকাল এদেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে প্রকাশ পাইতেছে। রোগীর মুখ ও নাসিকা নিঃসৃত

কতকগুলি কুকুরকে একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে ক্ষয়-কাসগ্রস্ত ব্যক্তির শ্লেষ্মা কোন উপায়ে সূক্ষ্মাকারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি দেখিলেন, গৃহ মধ্যস্থিত কয়েকটি কুকুর যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ক্ষত সংযোগেও এই বীজাণু মানবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল। তবে হস্তে ক্ষত থাকিলে যক্ষ্মারোগীর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ না করাই সমীচীন। অভিজ্ঞতা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে যক্ষ্মা-রোগীর সহিত একত্র বাস বা ভোজন করিলে এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে। রোগীর পরিত্যক্ত প্রশ্বাস পার্শ্বচরের নিশ্বাস সহযোগে দেহপ্রবিষ্ট হইয়া রোগানয়ন করিতে সমর্থ।

মেচ্‌নিকফ্, মারফন্ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ বলেন, যে সকল ব্যক্তি কোন এক প্রকার সহজসাধ্য ক্ষয়রোগ ভোগ করিয়া নিরাময় হইয়াছেন তাঁহারা কখন যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইবেন না। মেচ্‌নিকফের প্রথমা পত্নী যক্ষ্মা-রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

স্রাবের সহিত এই রোগের বীজাণু বহির্গত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির গলা বা নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাবকালে নিম্নলিখিত উপদেশ গুলি প্রতিপালন করিলে প্রায়ই রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। (১) সর্ব্বদা মুক্ত বায়ুতে থাকা। (২) জনতাপূর্ণ স্থানে না যাওয়া; (৩) গরম কাপড় পরিধান করা; (৪) মধ্যে মধ্যে কুইনাইন সেবন করা; (৫) রুমালে ইউকেলিপ্‌টাস্ অয়েল ব্যবহার করা। (৬) কুড়ি আউন্স জলে চা চামচের এক চামচ লবণ মিশাইয়া সেই জলে কুল্লি করা ও মধ্যে মধ্যে নাস লওয়া।

মেচ্‌নিকফ্ ঐ রোগগ্রস্তা স্ত্রীর সহিত বাস করিয়াও চিরদিন সুস্থ ছিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে তিনি বলিতেন যে বাল্যজীবনে তাঁহার গণ্ডমালা রোগ ছিল ; ঐ রসগ্রন্থির ক্ষয়-রোগই ভবিষ্যতে তাঁহার শরীরে টিকার কার্য্য করিয়াছে।

ক্ষয়কাসগ্রস্ত পিতামাতার সন্তান প্রায়ই পৈতৃক সম্পত্তির সহিত তাঁহাদের রোগটিও উত্তরাধিকারিস্বত্বে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কটন্ নামক একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক এক সহস্র যক্ষ্মা-রোগীর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তন্মধ্যে ৩৬৭ জন পিতৃ পিতামহ হইতে রোগ অর্জ্জন করিয়াছে। আধুনিক চিকিৎসকগণের মধ্যে কেহ কেহ যক্ষ্মাকে বংশগত ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন সন্তান জন্ম-কাল হইতে এই রোগবীজ বহন করে না ; তবে সাধারণ লোক অপেক্ষা ঐ বংশজ ব্যক্তিগণের এই রোগ প্রবণতা অধিক থাকে। যক্ষ্মা-বীজ দেহপ্রবিষ্ট হইলে স্বভাবজ ব্যাধি নিবারিণী শক্তি দ্বারা মনুষ্যগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু ক্ষয়-রোগীর বংশধরগণের দেহে এই ব্যাধির প্রতিষেধক শক্তি থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মোট কথা, “রামেণ বা রাবণেন বা” যক্ষ্মা-রোগীর সন্তান সন্ততির জীবনের ভাবিফল উভয় প্রকারেই সমান। এই জন্য কন্যা পুত্রের বিবাহ দিবার কালে বংশপরিচয় জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে তদ্বংশে কাহার যক্ষ্মা-রোগ হইয়াছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক।

অত্যধিক পরিশ্রম, শক্তির অতিরিক্ত বল প্রয়োগ, অনুপযুক্ত আহার, রাত্রিজাগরণ, অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবা, মদ্যপান, আর্দ্রভূমিতে বাস, দূষিত বায়ু সেবন, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব প্রভৃতি যক্ষ্মা-রোগের গৌণ কারণ। যে সকল ব্যক্তি কয়লার খনি, তুলা বা পাটের আড়তে কার্য্য করে তাহাদের এই রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। পল্লীবাসী অপেক্ষা নগর-বাসীদিগের মধ্যে ইহার প্রভাব সমধিক। ফলতঃ যে কোন কারণে শরীরের অনুলোম বা প্রতিলোম ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে শীঘ্রই তদ্দেহে যক্ষ্মা-রোগ-প্রবণতা আসিয়া পড়ে। এতদ্দেশীয় যুবকগণ অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় শারীরিক অত্যাচারের বিনিময়ে এই রোগ ক্রয় করিয়া থাকে।

এই কাল-ব্যাধির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে মনীষী প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি সকল মান্য করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান ও নির্ম্মল বায়ু সেবন এই রোগের প্রতিষেধক।

অরুণোদয়ের পূর্ব্বে শরীর আবৃত করত কিছুকাল মুক্ত বায়ুতে ক্ষিপ্রপদে পরিভ্রমণ করিলে শারীর-যন্ত্রগুলি সুদৃঢ় হয়। জগতে যে সকল লোক দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন। "Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise"—ইহা অমূল্য উপদেশ। বিচারপতি মান্‌সফিল্ডের ধর্ম্মাধিকরণে যে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন, তিনি তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে প্রাতরুত্থানই

তাঁহাদের দীর্ঘজীবন লাভের অন্যতম কারণ। যাঁহাদের ফুস্‌ফুস স্বভাবতঃ দুর্ব্বল তাঁহারা ধূলি-মল পরিশূন্য কোন এক বায়ুপূর্ণ স্থানে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিবেন। এই প্রক্রিয়ার পরিমিত অনুশীলন করিলে ঐ যন্ত্র শীঘ্রই সবল হইয়া উঠে; অপিচ ইহা দ্বারা চিত্ত প্রফুল্ল হয়।

ফুসফুসের ব্যায়াম অভ্যাস করিবার সময় মনকে চিন্তাশূন্য রাখা উচিত। তখন মনে এই ধারণা করিতে হইবে যে, প্রতি শ্বাসগ্রহণে বায়ু হইতে জীবনীশক্তি গ্রহণ করিতেছি। ইচ্ছাবৃত্তি স্বাস্থ্যলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। "আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলাম"—এই চিন্তা সতত মনোমধ্যে উদিত হইলে শীঘ্রই বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। "আমার যৌবনোচিত শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে"—এই ধারণা সদা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিলে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে।

হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষাচরিত প্রাণায়াম ক্রিয়াও ফুস্‌ফুসের আয়তন বৃদ্ধির পক্ষে উৎকৃষ্ট। সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে এই নিত্যকর্ম্মটি প্রতিদিন অনুষ্ঠান করিলে দেহস্থ সঞ্জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি হয়। এইরূপ ক্ষমতাপন্ন শরীরে রোগবীজ প্রায়শঃ অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবীর মধ্যে যক্ষ্মা-রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। শাস্ত্র বলিতেছেন—"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"। শরীরে শুক্র ধাতু অবিকৃত থাকিলে চিত্তপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়; দেহে দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। এই

জ্যোতির সম্মুখীন হইলে সকল জীবাণু ভস্মীভূত হইয়া যায়। সাত্ত্বিক আহার, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সাধুসঙ্গ ও সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইতে অভ্যাস করিলে আমরা অনেক রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি।

ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করিবে, কিন্তু তাহা বলিয়া বাজারের দূষিত ঘৃত ভোজনে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। আমরা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ একান্ত অসার বিলাসিতায় অযথা অর্থব্যয় করিয়া থাকি; কিন্তু অনেক সময় আদ্যধর্ম্ম শরীর রক্ষায় কপর্দ্দক ব্যয়েও কুণ্ঠিত হই। ইহা দ্বারা আমাদের লাভের গুড় যে পিপীলিকায় খাইতেছে, তাহা একবারও চিন্তা করি না। "ঘৃতং আয়ুঃ'—পবিত্র গব্য ঘৃতই শ্রেষ্ঠ রসায়ন। এই হৃদ্য সামগ্রী আজ দুর্লভ হইয়াছে বটে কিন্তু বাবুগিরির পরিচ্ছদ সার্ট, কোট্ রুমাল প্রভৃতির ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া তদর্থে পয়স্বিনী গাভী পুষিলে এ অভাব এখনও দূর হইতে পারে। গাভীর স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। পূর্ব্বকালে গৃহস্থগণ নিজ হস্তে গো-সেবা করিতেন। প্রায় প্রতি গ্রামে গো-চর মাঠ ছিল। গাভীসকল মাঠে নব নব তৃণ ভোজন করিয়া, দৌড়াদৌড়ি করিয়া হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ থাকিত। অধুনা আমরা গাভীকে অর্দ্ধাশনে এক অন্ধকূপ গৃহে দিবারাত্র আবদ্ধ রাখিয়া গো-হত্যার পাতকী হইতেছি। গাভীর দুঃখ দেখিবার আমাদের অবসর নাই। এদিকে আমাদের বিলাসিনী গৃহলক্ষ্মীরাও ভ্রমক্রমে কখন গোশালার ত্রিসীমায় পদার্পণ

করেন না। সুতরাং গৃহপালিত গাভীগুলির স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। পীড়িত গাভীর দুগ্ধপান হেতু দেশে ক্ষয় ও যকৃৎ রোগের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এ অবস্থার প্রতিকার না করিলে আমাদের কোন ক্রমেই মঙ্গল নাই।

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি তীক্ষ্ণ, অর্দ্ধপক্ক, বিরসতাপ্রাপ্ত, পর্য্যুষিত, পূতিগন্ধযুক্ত রাজস ও তামস আহার যথাসম্ভব বর্জ্জন করিবে। পশুমাংস সুপরীক্ষিত ও সুসিদ্ধ না হইলে আহার করা উচিত নহে। দুগ্ধ রীতিমত না ফুটাইয়া পান করা অবিধি। মদ্য, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

কাল মাহাত্ম্যে আজকাল বালকদিগের মধ্যেও চুরুট্, সিগারেট্ ও বিড়ি খাইবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ধূমপানজনিত প্রদাহ থাকিলে যক্ষ্মা-বীজাণু সহজেই তথায় বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। হুকায় তামাক খাইলে অপেক্ষাকৃত কম অপকার হয় বটে কিন্তু অনেক সময় অজ্ঞাতকুলশীল-ব্যক্তি-চুম্বিত হুকায় মুখস্পর্শ করিয়া অনেকে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

যক্ষ্মা-রোগীর কাস সংস্থিত বীজাণু বায়ুতাড়িত হইয়া উড়িতে থাকে; সুতরাং রোগীর গৃহে সর্ব্বদা গতায়াত করা উচিত নহে। রোগীকে পৃথক এক বাতালোকপূর্ণ ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। গৃহে মধ্যে মধ্যে গন্ধক পুড়াইলে বায়ুস্থ রোগ-বীজাণু বিনষ্ট হইতে পারে। রোগীর দেহ উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া গৃহের বায়ুপথগুলি উন্মুক্ত রাখিবে। এই রোগ-গ্রস্তা মাতা শিশুকে স্তন্যপান করাইবেন না।

রোগীকে যত্র তত্র কাস ফেলিতে দেওয়া অনুচিত। কোন একটি মৃত্তিকা পাত্রে পরিশোধক জল রাখিয়া তন্মধ্যে কফ, কাসাদি নিক্ষেপ করাই সুব্যবস্থা। পরে ঐ সকল বিষাক্ত শ্লেষ্মা আধারসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিলে রোগবিস্তারের ভয় দূর হয়।

মৃত রোগীর শয্যা বসনাদি দগ্ধ করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত একত্র ভোজন, একত্র শয়ন বা একত্র বসিয়া অধিকক্ষণ কথোপকথন করা বিধেয় নহে। এমন কি সম্ভব হইলে ক্ষয়রোগীর সহিত এক ভবনে বাস না করিলেই ভাল হয়। আমার জনৈক আত্মীয় উত্তর-পশ্চিম দেশে সরকারী ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার বংশের মধ্যে কাহারও যক্ষ্মা-রোগ ছিল না। তিনি হঠাৎ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তাঁহার শুশ্রূষাকারী পিতা, মাতা, ও অনুজদ্বয় এই খল রোগে একে একে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন

সুস্থদেহী রোগীর উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিবে না। যক্ষ্মা-রোগীর ভোজন-পাত্রাদিও কার্ব্বলিক লোশনে এবং ফুটন্ত জলে সুসংস্কৃত না করিয়া ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যক্ষ্মা-বীজাণু-মিশ্রিত ধূলিকণা উড়িয়া খাদ্যের সহিত প্রবিষ্ট হইলে রোগ হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব বাড়ীর অন্যান্য জনগণ খাদ্য দ্রব্যের বিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। মক্ষিকা দ্বারা সকল রোগ-বীজাণু স্থানান্তরে নীত হইতে পারে। সুতরাং ভোজ্য

সামগ্রীতে যাহাতে মক্ষিকা বসিতে না পারে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। রোগীর পরিচর্য্যাকারিগণ হস্ত ও পরিধেয় বসন উত্তমরূপে পরিশোধক জলে ধৌত করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিবে।

যে গৃহে যক্ষ্মা-রোগীর মৃত্যু হয় তাহা ফেনাইল অথবা কার্ব্বলিক লোশন দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া চূণকাম করিলে নিঃশঙ্ক বাসোপযোগী হইতে পারে। কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সেই বাড়ী এবম্বিধভাবে সংস্কৃত করিয়া লওয়া সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানের দার পরিগ্রহ করা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে। তাহারা আবাল্য ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়া পবিত্রভাবে কালযাপন করিবে। গব্যঘৃত, কড্‌লিভার তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করিবে। দিবসের অধিকাংশ ভাগ বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করিবে। অবস্থায় কুলাইলে জনাকীর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া সমুদ্রকূলে অথবা নাতিশীতোষ্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করাই সুব্যবস্থা। এই সকল লোকের পক্ষে দুই পাঁচ বৎসর সুনিয়মে থাকাই যথেষ্ট নহে। রোগবীজ সময় ও সুযোগ পাইলেই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। মনে রাখিবে—

"দেবে বর্ষত্যপি যথা ভূমৌ বীজানি কানিচিৎ।
শরদি প্রতিরোহন্তি, তথা ব্যাধি সমুচ্ছ্রয়াঃ"॥

ডিপ্‌থিরিয়া।

গ্রীক্‌ভাষায় "ডিপ্‌থেরা" শব্দের অর্থ আবরণ। এই রোগে গলার মধ্যে এক প্রকার পর্দ্দা পড়ে। এই জন্য ডাক্তারেরা ইহাকে ডিপ্‌থিরিয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যাধির জন্মস্থান ও সময় নির্ণয় করা এখন সহজসাধ্য নহে। তবে প্রাচীন ভিষক্‌দিগের গ্রন্থে দেখা যায় যে, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে ইহা একবার জনপদব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়। এই সময়ে ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড দেশের মধ্যেও ইহার আগমনের কথা শুনা গিয়াছে। কিন্তু তৎকালে ইংরাজ বৈদ্যগণ এই রোগের প্রভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বলোন্ নামক স্থানে ডিপ্‌থিরিয়া বদন ব্যাদান করিয়া লোক গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলে প্রতিভাশালী বিজ্ঞানবিদ্‌গণের চিত্ত ইহার প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। পুরাকালে মনীষিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই রোগকে স্কার্লেট্ জ্বরের রূপান্তর (Scarlet fever without eruptions) বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে গবেষণা দ্বারা সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রম বিজৃম্ভিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ডিপ্থিরিয়া জীবাণু-ঘটিত ব্যাধি। এই রোগের জীবাণু দেখিতে ঈষৎ বক্র অথবা সরল রেখার ন্যায়; কিন্তু উহাদের দুই মুখ গোলাকার। ক্লেভস্ ও লিওফ্লার নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথমে এই বীজাণু আবিষ্কৃত করেন। ঐ দুই মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য ডাক্তাররা অদ্যাবধি ডিপ্থিরিয়া রোগের জীবাণুকে "Klebs—Loeffler bacillus" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

যে ভাবে এই অণুদেহিগণ মানবদেহে রোগানয়ন করে তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া ফরাসীদেশবাসী ধীমান্ ইয়ারসিন্ ও ইংলণ্ডবাসী সূক্ষ্মদর্শী সিড্নি মার্টিন্ মহোদয়দ্বয় বিদ্বজ্জন সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়া রহিয়াছেন।

সাধারণতঃ গলনলী ও নাসিকার মধ্যেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে। বাহিরের প্রদাহযুক্ত স্থানেও ইহা জন্মিতে পারে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পেক্হাম সহরে এক গৃহস্থের কতিপয় শিশুসন্তানের ডিপ্থিরিয়া রোগ হয়। শিশুদিগের মাতা প্রথম হইতেই তাহাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে রোগাক্রান্ত হ'ন নাই। সন্তানগণ রোগমুক্ত হইলে একদিন মাতা মনে করিলেন, তাঁহার "ব্রন্কাইটিস্" রোগ জন্মিয়াছে। রোগশান্তির জন্য তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই নিজে বক্ষোদেশে এক বৃহৎ ব্লিষ্টার প্রদান করেন। কয়েক দিবস পরে ব্লিষ্টারের ক্ষত মধ্যে ডিপ্থিরিয়ার পর্দ্দা পড়িতে দেখা গিয়াছিল।

ডিপ্থিরিয়া-বীজাণু অনেকগুলি মিলিত হইয়া একস্থানে অবস্থান করে। উহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হইয়া রোগীর গলদেশে প্রবিষ্ট হয় এবং তথায় দলপুষ্ট হইতে থাকে। উহাদের গাত্রনিঃসৃত রস হইতেই এই সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হয়।

এই সকল জীবাণু সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তিকে প্রায়শঃ আক্রমণ করিতে পারে না। যে কোন কারণে মুখ গলনলী বা নাসিকা-মধ্যস্থ মিউকাস্-ঝিল্লি অসুস্থ হইলে জীবাণুগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। রোগীর গলমধ্যে যে পর্দ্দা পড়ে তন্মধ্যেই উহারা বাস করে। ঐ পর্দ্দার নিম্নস্তরে অথবা রক্ত মধ্যে উহাদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

এই রোগ প্রথমে স্থানিকরূপে প্রকাশ পায়। পরে জীবাণুর গাত্ররস শোষিত হইয়া রোগীর রক্ত দুষ্ট হইলে একে একে সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

"Pseudo-Diphtheria-bacillus" নামে এই জাতীয় আর এক প্রকার জীবাণু আছে। উহারা অনেক সময়ে সুস্থ মনুষ্যের মুখাভ্যন্তরে বসতি করে; অথচ আশ্রয়-দাতার কোন অনিষ্ট করে না। কোন একটি সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানে ৫৯ জন ছাত্রের মুখ পরীক্ষা করিয়া ২৬ জনের মুখ মধ্যে এই জীবাণু পাওয়া গিয়াছিল। ঐ স্থানে বহুকাল হইতে কাহার কখন ডিপ্থিরিয়া রোগ হয় নাই।

গলক্ষত রোগে ক্ষত মধ্যেও এই "Pseudo-Diphtheria-

bacillus" বর্ত্তমান থাকে। ইহারা ডিপ্‌থিরিয়া-জীবাণুর ন্যায় শক্তিশালী নহে। তবে কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে কোন কারণে মনুষ্যের স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে এবং গলমধ্যে ক্ষতাদি প্রকাশ পাইলে এই জাতীয় জীবাণুগুলি বলবান্ হইয়া ডিপ্‌থিরিয়া রোগ আনিতে পারে। কিন্তু ঐ মত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই।

ডিপ্‌থিরিয়া সংক্রামক ব্যাধি। গলক্ষত, মুখ ও গলনলীর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, টন্‌সিলের বিবৃদ্ধি, দন্ত-মাড়ির স্ফীতি, নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি প্রভৃতি ইহার উদ্দীপক কারণ। বসন্ত ও শরৎকালে এই রোগ অধিক হয়। দুই বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুদিগের এই ব্যাধি বড়ই মারাত্মক। ইহার নিকট স্ত্রী পুরুষ বিচার নাই। দুগ্ধ, বায়ু ও সার্জ্জিকেল অস্ত্রাদি সংযোগে এই রোগের জীবাণু সাধারণতঃ গলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। রোগীর প্রশ্বাস গ্রহণ করিলেও রোগ হওয়া অসম্ভব নহে।

ডিপ্‌থিরিয়া-বীজ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ২ হইতে ৭ দিনের মধ্যে রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে কষ্টবোধ, গলমধ্যে প্রদাহ ও তৎসঙ্গে জ্বর এই রোগের প্রথম লক্ষণ। তাহার পর পীড়িত স্থানে পর্দ্দা পড়ে। প্রদাহ-যুক্ত স্থানে এক বা বহু পর্দ্দা যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল আবৃত করিয়া ফেলে। এই পর্দ্দা উঠিয়া যাইলে নিম্নে ক্ষত দৃষ্ট হয়। ঐ ক্ষত হইতে অল্প অল্প রক্তস্রাব

হইতে থাকে। কোন কোন স্থানে পর্দ্দা একবার উঠিয়া গিয়া আবার নূতন পর্দ্দা পড়ে।

রোগ মৃদুভাবাপন্ন হইলে চতুর্থ অথবা পঞ্চম দিনে পর্দ্দা উঠিয়া যায় এবং আর নূতন পর্দ্দা প্রস্তুত হয় না। ঐ সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণ তিরোহিত হইয়া ৯।১০ দিনের মধ্যেই রোগী আরোগ্য লাভ করে।

পীড়া কঠিন ভাব ধারণ করিলে উপরি উক্ত পর্দ্দা প্রসারিত হইতে থাকে। অত্যধিক শ্বাসকষ্ট, প্রবল জ্বর ও গলার যন্ত্রণায় রোগী অস্থির হইয়া পড়ে। সামান্য তরল পদার্থও গলাধঃকরণ করিবার শক্তি থাকে না। গলার উভয় পার্শ্বের "লিম্ফাটিক্ গ্লাণ্ড" সকল সঙ্গে সঙ্গে স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত অপরাপর মারাত্মক লক্ষণ উপস্থিত হইয়া শীঘ্রই রোগীর জীবন নষ্ট করে।

এই রোগের আর এক লক্ষণ—পক্ষাঘাত। ঐ পক্ষাঘাত গলমধ্যে আরব্ধ হয়। রোগীর স্বর অনুনাসিক হইয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগারম্ভের অল্পদিন পরেই এই উপদ্রব উপস্থিত হয়। কিন্তু সচরাচর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বে উহা প্রকাশ পায় না।

পক্ষাঘাত প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর হস্তপদ অবশ হইতে থাকে। হৃদ্‌পিণ্ডের মাংসপেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় নাড়ী দুর্ব্বল, মৃদু ও ক্ষণবিলোপী হইয়া পড়ে; ক্রমে হৃদ্‌ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া হঠাৎ রোগীর মৃত্যু হয়। ডাক্তার

রজার বলেন ৩৪ জন রোগীর মধ্যে অন্ততঃ একজনেরও এই পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পারিসের কোন হাঁসপাতালে ২১০ জন ডিপ্থিরিয়াগ্রস্ত বালকবালিকা প্রবিষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে ৩১ জনের পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এই লক্ষণ প্রকাশ পাইবার নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে অনেক রোগীকে স্থানান্তরিত করা হয়। সকল রোগী একত্র বাস করিলে বোধ হয় পক্ষাঘাতগ্রস্তের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইত।

বাড়ীতে কাহারও ডিপ্থিরিয়া হইলে বালকবালিকাদিগকে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিবে; নিতান্ত অসুবিধা হইলে রোগীর ঘর হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিবে। প্রত্যহ কোন একটি জীবাণুনাশক জলে বাড়ীর সুস্থ জনগণকে তিন চারিবার কুল্লি করিতে দিবে*। রোগীর গৃহ প্রশস্ত ও বাতালোকপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। গৃহে যাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। ডাক্তার রুক্স ও ইয়ারসিন্ বলেন—ডিপ্থিরিয়া-জীবাণু রবিতাপ আদৌ সহ্য করিতে পারে না।

রোগীর কফ, কাস ও নাসিকা-নিঃসৃত সর্দ্দির সহিত এই রোগের জীবাণু বহির্গত হইয়া শয্যা, বসন ও নিকটস্থ তৈজস-পত্রে লিপ্ত থাকে; সুতরাং রোগীর গৃহে অনাবশ্যক দ্রব্য কখনই রাখিতে নাই। পুস্তক, খেলনা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য পুড়াইয়া

*কার্ব্বলিক এসিড ৫ গ্রেণ, গরম জল ৫ আউন্স মিশ্রিত করিয়া কুল্লি করা ভাল। নিম্বত্বক্ সিদ্ধজলেও কুল্লি করা যাইতে পারে।

ফেলা যাইবে না, এমন সামগ্রী রোগীকে ব্যবহার করিতে দিবে না। রোগীর কফ, কাস, সর্দ্দি প্রভৃতি ফেলিবার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট পাত্র রাখিবে। ঐ পাত্রে পরিশোধক জল রাখা আবশ্যক। এক এক খণ্ড কাগজে কফ, কাস নিক্ষেপ করিয়া তাহা মধ্যে মধ্যে পুড়াইয়া ফেলিলেই সর্ব্বাংশে ভাল হয়। যে দ্রব্য দ্বারা রোগীর গলমধ্যে ঔষধ প্রযুক্ত হইবে তাহাও তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিবে।

রোগীর গৃহে বিড়াল, কুকুর প্রভৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিড়ালের গলার মধ্যে ডিপ্‌থিরিয়ার ন্যায় এক প্রকার সংক্রামক রোগ জন্মে। ঐ সকল রোগগ্রস্ত বিড়াল শিশুদিগের মধ্যে এই রোগবিস্তারের সাহায্য করে।

বাড়ীতে যাহাতে মক্ষিকার উপদ্রব না হয়, সে পক্ষে যত্নবান হইতে হইবে; কারণ মক্ষিকাসকল রোগ-বীজাণু বহন করিয়া অনেক সময়ে রোগবিস্তারের হেতুভূত হইয়া থাকে।

রোগীর কক্ষে পরিচর্য্যাকারী ভিন্ন সাধারণ লোকের যাতায়াত নিষিদ্ধ। ঐ গৃহ হইতে কোন দ্রব্য বাহিরে আনিতে হইলে উহা ফুটন্ত ও পরিশোধক জলে ধৌত করিয়া গ্রহণ করা উচিত। রোগীর গলমধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় ঔষধদাতা একখণ্ড বস্ত্রের দ্বারা নিজের নাক মুখ রুদ্ধ করিবে। কারণ সে সময়ে রোগী কাসিলে বা হাঁচিলে রোগ-বীজ ঔষধদাতার মুখ বা নাসিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। পরিচর্য্যাকারী হস্ত ও পরিধেয় বসনাদি পরিশোধক জলে ধৌত না করিয়া অন্ন-পানাদি গ্রহণ

করিবে না। রোগীর গৃহে মধ্যে মধ্যে ইউকেলিপ্টাস ও তার্পিন তৈল ছিটাইয়া দেওয়া আবশ্যক। লোবান, অগুরু প্রভৃতি পুড়াইলেও গৃহ-বায়ু বিশুদ্ধ হয়। একখানি বস্ত্র ঔষধজলে ভিজাইয়া রোগীর গৃহের দরজায় সর্ব্বদাই ঝুলাইয়া রাখিবে। বস্ত্র শুষ্ক হইলে আবার ঔষধজলে নিমজ্জিত করিয়া লইবে।

পীড়িত-ব্যক্তি নিরাময় হইলেও তাহাকে কিছুকাল পৃথক রাখিবে। ডাক্তার ইয়ারসিন্ বলেন, পর্দ্দা বিলুপ্ত হইয়া গলনলী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও এই রোগের সংক্রামকতা নষ্ট হয় না; রোগ-বীজাণু দীর্ঘকাল রোগীর মুখাভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে। ডাক্তার লিয়োফ্লারের মতে রোগী সুস্থ হইলেও কয়েক মাস পর্য্যন্ত রোগ-জীবাণু তাহার মুখে অবস্থিতি করে। এই সময়ে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে মুখমধ্যস্থ মিউকাস্-ঝিল্লি আবার পীড়িত হইলে ঐ সকল জীবাণু তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার রোগোৎপাদন করিতে পারে। নাসিকা মধ্যস্থ ডিপ্থিরিয়া রোগে রোগ-লক্ষণ তিরোহিত হইলেও নাক হইতে এক প্রকার রক্তস্রাব হইতে থাকে। ঐ স্রাব মধ্যেও জীবাণু লক্ষিত হয়। এই সময়ে রোগী পৃথক বাস না করিলে রোগ-বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে।

গ্রামে ডিপ্থিরিয়া দেখা দিলে বাড়ী সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ড্রেণের গ্যাস যাহাতে বাড়ীতে প্রবিষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেকে বলেন, ড্রেণ

হইতে উত্থিত গ্যাসের মধ্যেই ডিপ্‌থিরিয়া-বীজাণু লুক্কায়িত থাকে। গৃহে কোন ভোজ্য সামগ্রী খোলা রাখিবে না। দুগ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে; যেহেতু দুগ্ধ বায়ুস্থ রোগ-বীজাণু সকলকে অত্যধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করে। রাত্রি জাগরণ, শীতসেবা, আর্দ্র-ভূমিতে শয়ন প্রভৃতি সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। পানীয় জল রীতিমত না ফুটাইয়া পান কবিবে না। গলার মধ্যে অল্প বেদনা হইলেই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। এই সময়ে প্রত্যহ জীবাণু-নাশক জলে কুল্লি করা সুব্যবস্থা।

সম্প্রতি ডিপ্‌থিরিয়া-নাশক এক প্রকার রক্তরস (Anti-toxin) আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপযুক্ত সময়ে বিধিপূর্ব্বক এই রস সূক্ষ্মমুখ পিচকারি দ্বারা হাইপোডার্মিকরূপে প্রয়োগ করিলে অচিরকাল মধ্যেই ডিপ্‌থিরিয়া-জীবাণুর মৃত্যু হয়। মহাত্মা ককের ছাত্র বেরিং সর্ব্বপ্রথমে এই প্রণালী দ্বারা ডিপ্‌থিরিয়া রোগীর চিকিৎসা করেন। এক্ষণে সকল বিজ্ঞ চিকিৎসকই ইহার উপকারিতা স্বীকার করিতেছেন; বার্লিন সহরের ফ্রেডারিক হাঁসপাতালে এই প্রণালী দ্বারা ডিপ্‌থিরিয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়া ডাক্তাররা মৃত্যুর হার শতকরা ১৩ হইতে দেখিয়াছেন।

এর্লিক, কেসেল ও ওয়াজরম্যান ২২০ জন রোগীকে এই প্রণালী দ্বারা চিকিৎসা করেন। রোগাক্রমণের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে এই রস যাহাদের দেহে প্রবিষ্ট করান

হয় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন শীঘ্রই নিরাময় হইযাছিল।

সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে মনুষ্যদেহে এই রস কেবল ডিপ্‌থিরিয়া-নাশক নহে; উহা ঐ রোগের প্রতিষেধকও বটে। ডাক্তার কেজ্‌ ৭২ জন বালক বালিকাকে এক রোগপূর্ণ স্থানে রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে এই বিষঘ্ন রস দ্বারা টিকা দিয়াছিলেন; তাহার ফলে টিকাধারিগণের মধ্যে ৮ জন মাত্র খুব মৃদুভাবে রোগাক্রান্ত হইয়াছিল।

এই টিকা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। ইহা বালকদিগকেও নিরাপদে দেওয়া যাইতে পারে। দেশে বা বাড়ীতে ডিপ্‌থিরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইলে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্যে এই টিকা গ্রহণ করা উচিত। তাহা হইলে রোগাক্রমণের শঙ্কা অনেক পরিমাণে দূর হইবে। যে সাংঘাতিক রোগ এতদিন দুরারোগ্য বলিয়া গণনীয় হইত, আজ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে তাহা চিকিৎসকের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ"।

জলাতঙ্ক।

জল দেখিলেই রোগী ভীত হয় বলিয়া এই রোগের নাম জলাতঙ্ক রাখা হইয়াছে*। ক্ষিপ্ত বৃক, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতির দংশন হইতেই ইহার উৎপত্তি। পল্লীগ্রামে ফেরুপালের উৎপাতে এক এক সময়ে লোক অস্থির হইয়া পড়ে। গত ১৩২১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের একদিন অপরাহ্নকালে আমাদের গোবরডাঙ্গা গ্রামে এক উন্মত্ত শৃগাল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবালবৃদ্ধ ২২ জনকে দন্তাঘাতে কাতর করিয়াছিল। দষ্ট-ব্যক্তিগণের মধ্যে ৩ জন জলাতঙ্ক রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঈশ্বরানুগ্রহে অবশিষ্ট জনগণ এখনও সুস্থ আছেন।

অখাদ্য ভোজন প্রভৃতি বহুবিধ কারণে জন্তুগণ ক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষজাতিই অধিক সময় আক্রান্ত হয়।

শৃগাল বা কুক্কুর উন্মত্ত হইলে প্রথমেই তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি কমিয়া যায়; সে নিয়ত অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে। তাহার জলপানেচ্ছা বলবতী হয়; খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকে না। সে তখন নিজের উদ্গীর্ণ সামগ্রী ও স্বীয় বিষ্ঠা পর্য্যন্ত

---

*ক্ষিপ্ত (Rabid) জন্তুগণের মধ্যে জল-ভীতি থাকে না। এই জল-ভীতি কেবলমাত্র মানবেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ভক্ষণ করিতেও ঘৃণাবোধ করে না। ক্রমে রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার মুখ হইতে অবিরত লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। এই সময়ে ঐ জন্তুর ক্রোধ এতাদৃশ প্রবল হয় যে, সে তখন ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করে এবং সম্মুখে যাহাকে দেখে তাহাকেই বিনা দোষে দংশন করে। এইরূপ ক্ষিপ্তাবস্থায় ঐ জন্তু মনুষ্য ও গবাদি যে কোন প্রাণীকে দন্তাহত করিলে তাহারই জলাতঙ্ক রোগ হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ব্বকালে কেহ কেহ মনে করিতেন সুস্থ কুক্কুর ও শৃগালে কামড়াইলেও জলাতঙ্ক রোগ জন্মিতে পারে। কিন্তু এখন পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ক্ষিপ্ত (Rabid) জন্তু দ্বারা দষ্ট না হইলে কখনই এই রোগ হয় না।

জলাতঙ্ক রোগের বীজ ক্ষিপ্ত জন্তুর লালার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। দষ্টস্থানে ঐ বিষাক্ত লালা নিপতিত হইয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং কিছুকাল গুপ্তাবস্থায় থাকিয়া রোগানয়ন করে। আবৃত স্থান দংশিত হইলে অনেক সময় ক্ষতমুখে বিষ পতিত হয় না ; আবার কোন কোন স্থানে বিষ নিপতিত হইলেও অত্যধিক রক্তস্রাব হেতু উহা দেহপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। এজন্য সকল ক্ষেত্রে দষ্ট-ব্যক্তির জলাতঙ্ক রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না।

ক্ষিপ্ত জন্তু প্রথমে যে সকল লোককে দংশন করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহাদের শেষে দংশন করে, তাহাদের রোগ জন্মিবার আশঙ্কা অনেক কম থাকে ; বিষের অসদ্ভাবই ইহার কারণ।

সুতরাং ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুক্কুর দষ্ট-ব্যক্তিমাত্রই যে জলাতঙ্ক রোগাক্রান্ত হইবে এমত বলা যায় না। জন্ হাণ্টার ২১ জন কুক্কুর-দষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবলমাত্র ১ জনের জলাতঙ্ক হইতে দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার ইলিয়ট্সন্ দুইটি বালিকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বালিকাদ্বয় একই সময়ে একটি ক্ষিপ্ত কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে একজন শীঘ্রই জলাতঙ্ক রোগে মারা পড়ে; কিন্তু অপরটি রোগাক্রান্ত হয় নাই।

শৃগাল বা কুক্কুরে কামড়াইলে যত দিন জলাতঙ্ক রোগ প্রকাশ না পায়, সেই সময়কে এই রোগের গুপ্তাবস্থা বলে। এতদ্দেশে একটি প্রবাদ আছে যে দংশনের পর ১৮ দিন অথবা ১৮ মাস মধ্যে এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বাদশ বর্ষ পরেও রোগ প্রকাশ পাইতে শুনা গিয়াছে। তবে সাধারণতঃ এক মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত এই রোগের গুপ্তাবস্থা। প্রাপ্তবয়স্ক অপেক্ষা বালকদিগের শীঘ্রই রোগ প্রকাশ পায়।

জলাতঙ্ক-বীজ ক্ষতমধ্যে সংলিপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কালক্রমে বিষ শিরোগত হইলে রোগ-লক্ষণ উপস্থিত হয়*। পীড়া প্রকাশিত হইবার অনতিপূর্ব্বে রোগী কখন শীত কখন বা গ্রীষ্ম, মস্তকঘূর্ণন, ভয়, মনশ্চাঞ্চল্য অনুভব করে। ইহার পরে জল-ভীতি প্রকাশ

*এজন্য মুখ বা মস্তকের দংশন অতিশয় বিপজ্জনক।

পায়। তখন সে জল, দুগ্ধ বা অপর কোন তরল পদার্থ আর গলাধঃকরণ করিতে পারে না; অথচ পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। ক্রমে জলদর্শন, জলস্পর্শ বা জলের নাম উচ্চারণ করিলেও রোগী ভয়ে অস্থির হইয়া উঠে। গলাধঃকরণ করিবার পেশীসকল আক্ষিপ্ত হয়। শ্বাসনালী ও ডায়েফ্রাম পেশীর আক্ষেপবশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র ও হিক্কা হইতে থাকে।

আমাদের দেশে জনসাধারণের মনে একটি কুসংস্কার আছে যে শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলে রোগী শৃগাল বা কুক্কুরের ন্যায় ধ্বনি করিতে থাকে। রোগী যে ধ্বনি করে তাহা প্রকৃতপক্ষে শৃগাল-কুক্কুরের ধ্বনি নহে; উহা হিক্কাধ্বনি মাত্র। ঐ ধ্বনির সহিত শৃগাল-কুক্কুরের ধ্বনির কোন সাদৃশ্য নাই।

রোগী পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ করে। মূত্রে যথেষ্ট পরিমাণে "মিউকাস্" লক্ষিত হয়। অজ্ঞলোকেরা ঐ "মিউকাস্"কেও কুক্কুর-শাবক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে।

স্নায়ুমণ্ডলের শক্তিহীনতা এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। রোগী ভাবী অশুভ চিন্তা করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে। সে তখন নানাবিধ অলীক বস্তু দর্শন করিতে থাকে। বিকটাকার মূর্ত্তি অথবা ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুসকল তাহার চতুষ্পার্শ্বে বেড়াইতেছে বলিয়া মনে ধারণা করে। কখন কখন শঙ্কিত ভাবে চীৎকার করিতে থাকে। তাহার মুখ হইতে প্রচুর লালাস্রাব হয়। অনুচ্চ শব্দ শ্রবণ অথবা আলোক দর্শন করিলে তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত ও আক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

অবশেষে অন্তিমকালে অচৈতন্যাবস্থা (Coma) উপস্থিত হইয়া তাহাকে কালকবলে নিপাতিত করে।

এই রোগের ভাবিফল নিতান্ত অশুভ। জলাতঙ্ক-রোগ প্রকাশ পাইলে আর কোন ক্রমেই রোগীর নিস্তার নাই। সচরাচর দুই তিন দিবসের মধ্যেই শ্বাসরোধে মৃত্যু হইয়া থাকে। ক্বচিৎ কেহ কেহ ৮।১০ দিবস কষ্টভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

শৃগাল-কুক্কুর দংশন করিলে দষ্ট-স্থান অবিলম্বে উষ্ণজলে ধৌত করিয়া উগ্র নাইট্রিক্ এসিড দ্বারা দগ্ধ করিবে। এই ঔষধের অভাবে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা ক্ষত স্থানটি পুড়াইয়া দিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তৎপরে, যতদূর দন্ত বিদ্ধ হইয়াছে তৎস্থানের মাংস কোন অস্ত্রচিকিৎসকের সাহায্যে কর্ত্তন করিয়া ফেলিবে। জলাতঙ্ক-রোগের বিষ কিছুদিন পর্য্যন্ত ক্ষতমধ্যে অবস্থিতি করে। সুতরাং দংশনের অব্যবহিত পরেই প্রাগুক্ত ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইলে অনেক সময় রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। কিন্তু তাহা বলিয়া কেবলমাত্র এই চিকিৎসার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। তবে যে সকল স্থলে দংশনকারী জীব দংশনের পর ১০ দিবস জীবিত থাকে তথায় উপরি উক্ত ব্যবস্থাই যথেষ্ট। সে সকল ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসা না হইলেও দষ্ট-ব্যক্তির জলাতঙ্ক প্রকাশ পাইবে না। শৃগাল কুক্কুরাদি ক্ষিপ্ত হইয়া ১০ দিবসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে জন্তু দংশনের পর ১০ দিবস জীবিত থাকে সে

নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত নহে; তাহার দংশনে জলাতঙ্কের আশঙ্কা নাই।

যে সকল স্থলে জন্তু ক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় অথবা দংশনের পর আর তাহাকে দেখিতে না পাওয়া যায়, তথায় কালবিলম্ব না করিয়া জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই সমীচীন। দংশনের পর এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রতিষেধক চিকিৎসা অবলম্বন করিলে জলাতঙ্কের ভয় থাকে না। পারিসের মহামতি পাষ্টুর মহোদয় এই চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কৃত করিয়া জগদ্বাসীর মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে এই দুরন্ত রোগের প্রতিষেধক চিকিৎসা জগতে ছিল না বলিলেই চলে। যদিও আমাদের দেশে এ-পাড়া ও-পাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামে গ্রামে এই রোগ-নিবারক ঔষধের অপ্রাচুর্য্য নাই এবং সকলেই তারস্বরে নিজ নিজ ঔষধের গুণ বর্ণনা করিয়া লোককে "হীরা-জীরার" পার্থক্য বুঝিতে দেয় না, তথাচ ঐ সকল অবৈজ্ঞানিক ভেষজের প্রতি কোন ক্রমেই আস্থা স্থাপন করা চলে না।

অধ্যাপক পাষ্টুর "য়্যাণ্টির্যাবিক্-ভাইরাস্" নামক জলাতঙ্ক-রোগ-নিবারক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুর-দষ্ট ব্যক্তির শরীরে পিচকারি দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োগ করেন। এখন পারিস সহরে এই চিকিৎসার ফলে কুকুর-দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর হার প্রতি সহস্রে দুই তিন মাত্র। অধুনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এই চিকিৎসার উপকারিতা স্বীকার

করিতেছেন। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে বিনামূল্যে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া ভারতবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সিমলা শৈলের সন্নিকটে কশৌলি নামক স্থানে এবং মাদ্রাজ প্রদেশান্তর্গত কন্নুর নগরে গভর্ণমেণ্ট এই রোগের দুইটি চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। আজকাল শুনিতেছি শিলং সহরেও আর একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল গভর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত চিকিৎসালয়ে ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলেই তুল্যভাবে চিকিৎসিত হইতে পারেন।

কশৌলি সহর ৬৩০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে পৌঁছিতে হইলে হাওড়া হইতে রেলযোগে কাল্‌কা এবং তথা হইতে পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে অথবা রিক্‌শ নামক গাড়ীতে ৯ মাইল পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পথের একদিকে গভীর খাদ এবং অপরদিকে গগনস্পর্শী পাষাণস্তূপ। পথ সর্পগতির ন্যায় বাঁকাভাবে ক্রমেই হিমাচলে উঠিয়াছে। শৃগাল কুকুর-দষ্ট নিঃস্ব লোক এবং অল্প বেতনভোগী গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ আবেদন করিলে বিনা ব্যয়ে কশৌলি যাইতে পারেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে গভর্ণমেণ্ট বাসস্থান ও খোরাকি দিয়া থাকেন। প্রত্যহ শতাধিক কুকুর-দষ্ট ব্যক্তি এখানকার হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হয়।

জলাতঙ্ক -রোগের প্রতিষেধক চিকিৎসাপ্রণালী অতি সুন্দর। বেলা ১০ টার পর হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলে ডাক্তার সাহেব

একবার মাত্র ঔষধ-দ্রব্য সূক্ষ্মমুখ পিচকারি দ্বারা রোগীর উদরের চর্ম্মে প্রবিষ্ট করান। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা বা যন্ত্রণা নাই। ছোট ছোট বালকবালিকারা পর্য্যন্ত অসঙ্কোচে এই "ইন্‌জেকসন্" গ্রহণ করিয়া থাকে। উদরের যে স্থানে "ইন্‌জেকসন্" দেওয়া হয় তথায় দুই এক দিন অল্প বেদনা অনুভূত হয় মাত্র; কিন্তু তজ্জনিত জ্বর বা অপর কোন প্রকার অসুস্থতা উপস্থিত হয় না। রোগীর অবস্থানুসারে ১৪ হইতে ১৮ দিনের মধ্যেই চিকিৎসা সমাপ্ত হইয়া যায়। তখন দষ্ট-ব্যক্তি নিরাময় হইয়া বাড়ী আসিতে পারেন। তবে এই স্থানে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে জলাতঙ্ক-রোগ প্রকাশ পাইলে আর কশৌলি যাইবার আবশ্যকতা নাই। সে সময় চিকিৎসার দ্বারা কোন ফল লাভ হয় না। তখন রোগীকে এক জনশূন্য, অন্ধকার ঘরে মশারির মধ্যে রাখিয়া দিবে। রোগীর লালা তোমার গাত্রস্পর্শ না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। দেহস্থ ক্ষতে ঐ লালা সংযুক্ত হইলে তোমারও জলাতঙ্ক-রোগ জন্মিতে পারে।

ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুক্কুর-দষ্ট ব্যক্তি কাল বিলম্ব না করিয়া কশৌলি যাত্রা করিবে। দংশনের পর সপ্তাহ মধ্যে তথাকার হাঁসপাতালে উপস্থিত হওয়াই বিধি। কাল বিলম্ব করিলে চিকিৎসার ফলেরও তারতম্য ঘটিতে পারে।

অসমর্থ ব্যক্তি দংশনের পরই জেলার সিভিল সার্জ্জন অথবা (মিউনিসিপালিটির মধ্যে বসতি হইলে) চেয়ারম্যানের নিকট কশৌলি যাইবার জন্য আবেদন করিবে। তাহা হইলে বিনা ব্যয়ে

তথায় পৌঁছিবার সুব্যবস্থা হইবে। কন্নুর বা শিলং হাঁসপাতালে যাইতে চাহিলেও তাঁহারা খরচ দিয়া পাঠাইয়া দিবেন।

জলাতঙ্কের ন্যায় সাংঘাতিক ব্যাধির এমন অনায়াসলভ্য প্রতিষেধক চিকিৎসা থাকিতে রাম-শ্যামের কথায় প্রতারিত হইয়া অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। জগতে একমাত্র পাষ্টুর উদ্ভাবিত চিকিৎসাই এই রোগ-বিষকে সমূলে ধ্বংস করিতে সমর্থ।

ক্ষত শুষ্ক হইয়া ২৬ মাস বেশ সুস্থ থাকিলেও অচিকিৎসিত ব্যক্তির রোগাক্রমণের ভয় দূর হয় না। আশ্রিত বিষ কোন্ দিন স্বরূপ ধারণ করিয়া আশ্রয় নষ্ট করিবে তাহা কে বলিতে পারে? অতএব সময় থাকিতে সতর্ক হইবে;—হেলায় জীবন নষ্ট করিও না।

ধনুষ্টঙ্কার।

ধনুষ্টঙ্কার-রোগের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করা এখন সহজ সাধ্য নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে এই ব্যাধি ভারতে বসতি করিতেছে। চরক বলিয়াছেন—

"পীড়য়ন্ হৃদয়ং গত্বা শিরঃ শঙ্খৌ চ পীড়য়ন্।
ধনুর্ব্বন্নময়েদ্গাত্রাণ্যাক্ষিপেন্মোহয়েত্তদা" ॥

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, চারকীয় যুগেও এতদ্দেশে ইহার আধিপত্য অল্প ছিল না। বয়োধর্ম্মে এই সুপ্রাচীন ব্যাধির তেজোহানি হয় নাই। ইহার সংহারিণী শক্তি আজও বেশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বঙ্গপল্লীসমূহে এক ম্যালেরিয়া জ্বরই সহস্র-বদন হইয়া লোক গ্রাস করিতেছে। পল্লীবাসীর জীবন ম্যালেরিয়ার তাড়নেই বাত-কম্পিত দীপ-শিখার ন্যায় সতত বিচঞ্চল। ইহা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয়, ধনুষ্টঙ্কার জনশূন্য পল্লীগ্রামে নিজ প্রভাব সর্ব্বদা প্রকাশ করে না; তবে মধ্যে মধ্যে সূতিকাগারে গিয়া প্রসূতি ও শিশুর সংবাদ লইয়া থাকে।

জনাকীর্ণ সহরের ধূলিমণ্ডিত রাজপথগুলিই ইহার বিহার স্থান। এক কলিকাতা সহরে ইহার আক্রমণে কোন কোন সপ্তাহে ২০ জনেরও অধিক লোক মানবলীলা সম্বরণ করে।

আহত, বিক্ষত, ও অস্ত্রবিদ্ধ জনগণের প্রতি ধনুষ্টঙ্কারের অনুগ্রহ দৃষ্টি অধিক। এই জন্য সমরাঙ্গন পরিদর্শন করা ইহার আবাল্য অভ্যাস। আঘাত-প্রাপ্ত সৈনিকের দেহপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে শান্তি নিকেতনে প্রেরণ করিতে এই ব্যাধি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে। গত আমেরিকার যুদ্ধে ৮৭৮২২ জন আহত ব্যক্তির মধ্যে ৩৬৩ জনের ধনুষ্টঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তাররা জীবাণু-নাশক চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কৃত করিয়া এই শ্রেণীর ব্যাধির গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহারা রণে ভঙ্গ দিবার পাত্র নহে। বাসগৃহ যেরূপ রজ্জু-কাষ্ঠাদি দ্বারা সুশ্লিষ্ট না রাখিতে পারিলে প্রবল বাত্যা আসিয়া তাহাকে ভগ্ন করে, এই সঙ্কট সঙ্কুল স্থানে বাস করিয়া দেহ-গেহ তেমনই সুনিয়মাদি সহায়ে সুরক্ষিত না করিলে অলক্ষ্যে ঐ সকল রোগ আসিয়া তাহাকে পাতিত করিয়া ফেলে।

ধনুষ্টঙ্কার-রোগে শরীর দুর্দ্দমনীয়রূপে আকুঞ্চিত হইয়া ধনুর্ব্বৎ বক্রাকৃতি ধারণ করে। সম্মুখ, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব সকল-দিকেই দেহ বক্র হইতে পারে। সম্মুখদিকে বক্র হইলে পুরস্টঙ্কার (Emprosthotonos), পশ্চাৎদিকে বক্র হইলে পশ্চাটুঙ্কার (Opisthotonos) এবং পার্শ্বদিকে বক্র হইলে পার্শ্ব টঙ্কার (Pleurosthotonos) নামে ইহা অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ত্রিবিধ টঙ্কারের মধ্যে পশ্চাটুঙ্কারই (Opisthotonos) সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন

ক্ষেত্রে দেহ যষ্টিবৎ কঠিন হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চরক এই অবস্থাকে দণ্ডক রোগাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

আর্দ্রভূমিতে শয়ন, অত্যধিক শীত সেবা অথবা কোন প্রকার বাহ্য আঘাতই এই রোগের নিদান মধ্যে গণনীয় হইত। কিন্তু কিছুকাল হইল নিকোলিয়ার নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে এই রোগের এক প্রকার জীবাণু আছে। ঐ জীবাণুগণ দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখার ন্যায়, তবে উহাদের উভয় প্রান্ত গোলাকার। জয়ঢাক বাজাইবার যষ্টির সহিত ইহাদের অবয়বের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে

এই সকল কালরূপী জীবাণু দূষিত জলে অথবা রাজপথে ধূলিকণা মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া যাইলে অথবা দলিত, পেষিত, আহত বা দগ্ধ হইলে উহারা তন্মধ্য দিয়া দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এই দুষ্ট অণুদেহিনিচয় সামান্য একটু ক্ষত দেখিলেই তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। শরীরের কোন স্থানের ত্বক্ অল্প উঠিয়া যাইলে কিংবা কোন স্থানে পেরেক, আলপিন বা তদ্বৎ কোন সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র বিদ্ধ হইলে উহারা ঐ চক্ষুর অগোচর রন্ধ্র দিয়া অনায়াসে দেহাভ্যন্তরে চলিয়া যায়। ডাক্তার টেলার বলেন—কোন একটি ধনুষ্টঙ্কার-রোগীর শরীরে ক্ষতাদি কিছুই দৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু তাহার জীবনাবসানের স্বল্পকাল পূর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে একটি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। তখন অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে রোগাক্রমণের কতিপয় দিবস

পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটি কণ্টক বিদ্ধ হয়। এই সামান্য ঘটনার প্রতি রোগীর মন আদৌ আকৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং সে চিকিৎসকের নিকট ইহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের "ব্রিটিস মেডিকেল জার্ণাল" নামক পত্রে এইরূপ আরও কয়েকটি রোগীর কথা লিখিত আছে।

ধনুষ্টঙ্কার-রোগ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যে সকল স্থলে আঘাত প্রাপ্তির পর রোগ প্রকাশ পায় তাহাকে আঘাত-জনিত (Traumatic) ধনুষ্টঙ্কার বলে। অঙ্গে আঘাতের কোন চিহ্ন লক্ষিত না হইলে এই রোগ স্বতোজাত (Idiopathic) ধনুষ্টঙ্কার নামে কথিত হয়। কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে শরীরের যে কোন দ্বার দিয়া রোগ-বীজাণু প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় ধারণা করিতে হইবে। এই রোগের জীবাণু দেহাভ্যন্তরস্থ না হইলে কখনই প্রকৃত ধনুষ্টঙ্কার রোগ জন্মে না। আর্দ্রভূমিতে শয়নোপবেশন এবং শীত-ভোগাদি এই রোগের উদ্দীপক কারণ মাত্র।

সূতিকাগারে প্রসূতি ও নবজাত শিশুর এই ব্যাধি যথেষ্ট হইয়া থাকে। এক বোম্বাই সহরে ৩ বৎসরে ২৩২ জন প্রসূতি এই রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। প্রসূতির প্রসব-দ্বার ও শিশুর নাভীক্ষত দিয়া এই জীবাণু দেহমধ্যে উপনীত হয়। অস্বাস্থ্যকর সূতিকাগৃহে বাস করিলে সন্তান ও প্রসবিত্রী—উভয়েরই এই রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দুই সপ্তাহ মধ্যেই রোগ প্রকাশ

পাইবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। নবপ্রসূগণের মধ্যে অনেকে প্রসবের পর সপ্তাহকাল মধ্যেই রোগাক্রান্ত হয়। ওয়ারিং নামক একজন বহুদর্শী ব্যক্তি দুই শতাধিক ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত প্রসূতির হিসাব রাখিয়া দেখিয়াছেন, প্রসবের প্রথম দিনে ৭ জন, দ্বিতীয় দিনে ৩২ জন, তৃতীয় দিনে ২৯ জন, চতুর্থ দিনে ২৩ জন, পঞ্চম দিনে ২২ জন ষষ্ঠ দিনে ৩২ জন, সপ্তম দিনে ১৫ জন, অষ্টম দিনে ১৪ জন, নবম দিনে ১৫ জন, দশম দিনে ১৪ জন, একাদশ দিনে ২ জন, দ্বাদশ দিনে ৯ জন, ত্রয়োদশ দিনে ৪ জন, চতুর্দ্দশ দিনে ১ জন, সপ্তদশ দিনে ১ জন এবং অষ্টাদশ দিনে ১ জন রোগাক্রান্ত হইয়াছিল।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জসমূহে নিগ্রোদিগের মধ্যে প্রসবাগারে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু দেহপ্রবিষ্ট হইয়া তথায় বংশবৃদ্ধি করত এক প্রকার বিষ-পদার্থ উৎপন্ন করে। ঐ বিষ-পদার্থ দ্বারা মেরুদণ্ড উত্তেজিত হইলে রোগলক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

উষ্ণপ্রধান স্থানে ইহার প্রভাব অধিক। কিন্তু সার্ জেমস্ সিমসন্ ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, শীত গ্রীষ্মের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। তবে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে যে, য়ুরোপ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের লোক গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া বাস করিলে তত্রত্য অধিবাসী অপেক্ষা নবাগতগণ ইহা দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্প আক্রান্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে লোক সকল মনে করিত, পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ এই রোগে অধিক পীড়িত হয়; কিন্তু সে ধারণা ভ্রমাত্মক। পুরুষের প্রতিই ইহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি অধিক। ১০৬৯ জন ধনুষ্টঙ্কার-রোগীর তালিকা মধ্যে ৮২৯ জন পুরুষ ও ২৪০ জন মাত্র স্ত্রীলোক থাকিতে দেখা গিয়াছে। কার্ণিং ১২৮ জন রোগীর তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১২ জন পুরুষ ও ১৬ জন স্ত্রী ছিল। গ্লাসগো সহরের অধ্যাপক লরি মহোদয় যে ২২১ জন রোগীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যেও রমণী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক।

"লক্ জ" (Lock-jaw) এই রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে রোগী মুখব্যাদান করিতে কষ্টানুভব করে; ক্রমে নিম্ন হন্বস্থির মাংসপেশী সবল আড়ষ্ট ও সঙ্কুচিত হয়। এই অবস্থাকে ডাক্তাররা "লক্-জ" বলিয়া থাকেন। এই সময়ে রোগী কোন পথ্যই আর গলাধঃকরণ করিতে পারে না। ধনুষ্টঙ্কারের সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া যদি ঐ আদ্য লক্ষণের অভাব থাকে তবে তাহাকে প্রকৃত ধনুষ্টঙ্কার রোগ বলা যাইতে পারে না। অপর পক্ষে মূল লক্ষণ "লক্-জ" প্রকাশ পাইলে রোগী ধনুষ্টঙ্কারাক্রান্ত হইয়াছে, ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়। রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত পেশী আক্ষিপ্ত হইতে থাকে। একবার আক্ষেপের পর কিছুকাল বিরামাবস্থায় থাকিয়া আবার আক্ষেপ উপস্থিত হয়। রোগ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে বিরামকাল আর লক্ষ্য করা অসম্ভব হইয়া

পড়ে। তখন রোগীর গাত্রস্পর্শ করিলে বা শরীরে প্রবল বাতাস লাগিলে "ফিট্" হইতে থাকে। এই মাংসপেশীর আক্ষেপ দমন করা রোগীর সাধ্যাতীত বল প্রকাশ করিলে আক্ষেপ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয় আক্ষেপ কালে রোগী এক প্রকার অস্পষ্ট কাতরোক্তি প্রকাশ করে।

সূতিকাগারে শিশুর এই রোগ হইলে প্রথমেই শিশুর চোয়াল ধরিয়া যায়। সে তখন স্তন্যপানে অসমর্থ হয়। ক্রমে তাহার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট ও আকুঞ্চিত হইতে থাকে। শিশুর হস্তের মুষ্টি দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকে এবং তাহার গ্রীবাটিও সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হইয়া উঠে

এই রোগের ভাবিফল নিতান্ত মন্দ। রোগীর প্রাণরক্ষা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। তবে রোগ-লক্ষণ মৃদুগতি হইলে এবং রোগী ১০ দিবস জীবিত থাকিলে আশার দীপবর্ত্তিকা উজ্জ্বল হওয়াও হইতে পারে পাঁচ দিবসের মধ্যেই অধিকাংশ রোগী প্রাণত্যাগ করে। শ্বাস রোধ প্রায়শঃ মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

ধনুষ্টঙ্কার সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া বর্ণিত হইযাছে। সুতরাং এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে এক পৃথক অন্ধকার গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। বাতালোকপূর্ণ স্থানে ধনুষ্টঙ্কার-রোগীকে রাখিলে তাহার রোগ বৃদ্ধি হয়। পরিচর্য্যাকারী ভিন্ন ঐ ঘরে অপর লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রোগীর ক্ষত মধ্যে ও মূত্রে এই রোগের জীবাণু দৃষ্ট হয়। অতএব রোগীর ক্ষত "ড্রেস"

করিবার সময় বিশেষ সতর্ক থাকিবে। যে স্থানে রোগীর মূত্র নিক্ষিপ্ত হয়, সে স্থান আবলম্বে কার্ব্বলিক লোশন দ্বারা ধৌত করিবে। রোগীর সমল শয্যাবসনাদি দগ্ধ করাই সুব্যবস্থা। পরিচর্য্যাকারী নিজ হস্ত বিশোধক ঔষধ ও সাবানজলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করিবে। যে গৃহে ধনুষ্টঙ্কার-রোগীর মৃত্যু হয়, তাহা ঔষধ জলে বিশোধিত ও চূণকাম করিয়া ব্যবহার করাই সমীচীন।

ধনুষ্টঙ্কার-জীবাণু সাধারণতঃ বায়ুতাড়িত হইয়া ধূলিকণার সহিত ক্ষত মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ক্ষতস্থান কার্ব্বলিক অয়েল* বা তদ্বৎ কোন জীবাণুনাশক ঔষধ দ্বারা সর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখিলে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। সামান্য আঁচড়ও উপেক্ষণীয় নহে। কোন স্থান একটু কাটিয়া যাইলে বা দগ্ধ হইলে অবিলম্বে সতর্ক হইবে। কাঁচে কাটিয়া গিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইতে শুনা গিয়াছে। ফলতঃ এই সকল আগন্তুক আণুবীক্ষণিক জীবাণুর প্রবেশ-দ্বার অর্গলবদ্ধ রাখিলে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা থাকে না। ডাক্তার ডা কষ্টা বলেন—

"Perfect asepsis surgical procedure means freedom from tetanus as surely as it means freedom from septicaemia."

আমাদের দেশের অনেক লোক শরীরে সামান্য একটু ক্ষত

*কার্ব্বলিক এসিড ১ ভাগ, অলিভ অয়েল (বা তদভাবে নারিকেল তৈল) ৯ ভাগ।

হইলে বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। অপরিষ্কৃত জলে ক্ষত ধৌত করিলে বা ক্ষত অনাবৃত রাখিলে, ঐ জল বা ক্ষতের পার্শ্বে স্থিত বায়ু কি ভাবে ক্ষত দূষিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা তাঁহাদের মনে কখন উদিত হয় না আবার ইহাও দেখিতে পাই কাহারও কোন স্থানের চর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইল, অথবা কাটিয়া যাইল, অমনই তিনি তৎস্থানের রক্ত রুদ্ধ করিবার জন্য রাস্তা হইতে কিঞ্চিৎ মাটী লইয়া ক্ষতমুখে সংযুক্ত করিলেন। এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ আমরা অনেক সময় অনেক রোগকে সাদরে আহ্বান করিয়া থাকি। এতদ্দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে বীজাণুতত্ত্বের আলোচনা নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশবাসিগণ এই সকল অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করিয়া তাঁহাদের স্নিগ্ধ মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিতে রাজি নহেন। যে সময়-ক্ষেপ করিয়া তাঁহারা এতদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবেন, সেই সময়টুকু সবান্ধবে বসিয়া পরছিদ্রানুসরণ ও পরনিন্দা করিয়া কাটাইতে পারিলেই তাঁহারা সুখী। বিজ্ঞানালোকদীপ্ত য়ুরোপের রমণীগণ পর্য্যন্ত এই সকল জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশের পুরুষেরাও এতদ্বিষয়ে উদাসীন।

আর্দ্রভূমিতে বাস, অনাবৃত গাত্রে হিমভোগ প্রভৃতি ধনুষ্টঙ্কার-রোগের উদ্দীপক কারণগুলি সর্ব্বথা পরিহার্য্য। সূতিকাগারের দোষে এতদ্দেশে অনেক প্রসূতি ও শিশু অকালে ধনুষ্টঙ্কার-রোগে মারা পড়ে। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে শিশুর মৃত্যুর হার শতকরা ৮; অপর পক্ষে আমাদের দেশে শতকরা ৪৮টি শিশু

অতি শৈশবেই প্রাণত্যাগ করে। এদেশে সাধারণতঃ যেরূপ-ভাবে সূতিকাগার নির্ম্মিত হয়, তাহাতে তাহাকে "যমাগার" বলিলেও বোধ হয় দোষ হয় না। সেই পূতিগন্ধময় দারুণ অস্বাস্থ্যকর সূতিকাগারের দোষে কত শত ক্ষুদ্র শিশু অকালে চলিয়া যায়, কে তাহার সংখ্যা করে? আমরা নিজ নিজ বাস-গৃহটি যাহাতে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, যাহাতে উহার মধ্যে আলোক-বায়ু সমানভাবে প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া থাকি। আর্দ্র মৃত্তিকাতে শয়ন করিলে পীড়া হইতে পারে এই ভয়ে খাট্ বা পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন স্থান নির্দ্দেশ করি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নবজাত শিশুর ঐ সকল সুখ শান্তির দিকে আমরা একবারও ফিরিয়া চাহি না। আমরা প্রকাশ করি, শিশু আমাদের বড় আদরের সামগ্রী; শিশুকে আমরা প্রাণতুল্য ভালবাসি। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে আমরা কত আনন্দোৎসব করিয়া থাকি, কত বন্ধুবান্ধবকে ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট করি—কত দেবতার পূজা করি। শিশুর মৃত্যুতে আমরা কাঁদিয়া আকুল হই; সংসার শূন্য দেখি। কিন্তু শিশুকে জীবদ্দশায় গৃহপ্রাঙ্গণে শীতবাতসমাকুল, শুষ্ক খর্জ্জুর পত্রাচ্ছাদিত এক জঘন্য স্থানে রাখিয়া উহার অকাল মৃত্যুর হেতুভূত হইয়া থাকি। হায়! হায়! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

বাড়ীর মধ্যে যে ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, যে ঘরের মেঝে বেশ খট্‌খটে এবং যে ঘরে রৌদ্র ও আলোক সমানভাবে প্রবেশ করে, সেই ঘরেই সূতিকাগার হওয়া উচিত। আমাদের

দেশে একটা কুসংস্কার আছে যে সূতিকাগার হইলেই ঐ স্থান অশুদ্ধ হয়। যে স্থানে আমাদের বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, সে স্থান যদি অশুদ্ধ হয়—সে স্থান যদি অপবিত্র হয়—তবে আমরা কাহার সুখ শান্তির জন্য এই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কোঠা-বালাখানা প্রস্তুত করি? অতএব জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, কুসংস্কার ত্যাগ কর, যাহাতে হেলায় শিশুর জীবন নষ্ট না হয় তৎপক্ষে যত্নবান হও। শীতের রাত্রিতে এক বিন্দু ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আমরা রাশি রাশি উষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকি, আর নবনীত-কোমল শিশুকে অবাধে বাহিরের কোন এক অনাবৃত স্থানে আর্দ্র মৃত্তিকার উপরে একখানি মলিন ছিন্ন কন্থা বা মাদুর পাতিয়া ফেলিয়া রাখি। শিশুর শক্তি কতটুকু? সে কতক্ষণ শীত-বাতের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়? সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, পরদিন প্রাতে শুনিলাম শিশুটি মারা গিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশু সারারাত্রি হিমভোগ করিয়া স্বরভঙ্গ, জ্বর, পক্ষাঘাত, বাত অথবা ধনুষ্টঙ্কার-রোগে মারা পড়িল, আর ভ্রমান্ধ আমরা ছেলেকে "পেঁচোয়" পাইয়াছিল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

বাহিরে সূতিকাগার প্রস্তুত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। স্থানটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, খট্‌খটে এবং প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। উহার নিকটে কোন নালা, নর্দ্দামা বা দুর্গন্ধময় স্থান থাকিবে না। ঘরটি দৈর্ঘ্যে দশ বার হাত এবং প্রস্থে পাঁচ ছয় হাত হইলে ভাল হয়। ঘরখানি

এরূপভাবে প্রস্তুত হইবে যে উহার মধ্যে হিম প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু ঐ সঙ্গে বায়ু গতায়াতের জন্য প্রশস্ত জানালা রাখিতে যেন ভুল না হয়। বিলাতের কোন এক সরকারি প্রসবাগারে প্রথম প্রথম ভূমিষ্ঠ হইবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে অনেক শিশু মারা পড়ে। শিশুর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তত্রত্য প্রথিতনামা চিকিৎসকগণ বুঝিলেন যে উক্ত গৃহে আবশ্যক বায়ু গমনাগমনের অভাব হইতেছে। এই অভাব দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মৃত্যু সংখ্যা অনেক হ্রাস হইল। বিশুদ্ধ বায়ুই আমাদের জীবন। কফ-কাসাদি চিহ্নিত, মূত্রগন্ধে আমোদিত, বাতালোকবিহীন গৃহ মধ্যে বাস করাইলে শিশুর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের আশা সুদূর পরাহত। কতদিনে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার ঘুচিবে তাহা জগদীশ্বর জানেন।

শিশুর শয্যা বসনাদির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখাও নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদের এতদ্বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই। কোন নবীনা ইংরাজ-জননীর শয্যা-বসন দেখিয়া তাহাকে নবপ্রসূ বলিয়া মনে করা যায় না। অপর পক্ষে এতদ্দেশীয় প্রসূতিগণ যে কক্ষে শিশুসন্তান লইয়া বাস করেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে মুহূর্ত্তকালও থাকিতে ইচ্ছা হয় না। সূতিকাগারে শিশুর ভাগ্যে কয়েকখানি মলিন কন্থা বা বস্ত্রখণ্ড ভিন্ন বড় কিছু মিলে না। প্রসূতি ও শিশুর পরিচর্য্যা করিবার জন্য যে পরিচারিকা নিযুক্ত হয়, তাহার পরিধেয়

বস্ত্রখানিও মসিকৃষ্ণবর্ণ। শিশু অনেক সময় পরিচারিকার ক্রোড়েই শায়িত থাকে। অপরিষ্কৃত শয্যা-বসন ধনুষ্টঙ্কার-রোগের অন্যতম কারণ। ঐ সকল মলিন বসনে রোগ-বীজাণু লিপ্ত থাকা অসম্ভব নহে।

পল্লীগ্রামে সচরাচর এক খণ্ড চেঁচাড়ির দ্বারা শিশুর নাড়ী-কাটা হইয়া থাকে। এ প্রথা অতিশয় দূষণীয়। নাড়ীকাটার দোষে এবং নাভীক্ষত অপরিষ্কৃত রাখিলে শিশুদিগের প্রায়ই ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইয়া থাকে।

একখানি তীক্ষ্ণধার কাঁচি পরিশোধক জলে কিছুক্ষণ নিমজ্জিত রাখিয়া পরে ঐ কাঁচি দ্বারা নাড়ীচ্ছেদ করাই সুব্যবস্থা।

ক্ষতস্থান অনাবৃত রাখিবে না। কোন একটি অনুগ্র জীবাণু-নাশক ঔষধ দ্বারা ক্ষত "ড্রেস" করিবে*। "ড্রেসিঙ্গ" সিক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

কিছুদিন হইল কোটানি ও টিজোনি নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত জীবের রক্তরস হইতে এক প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ইহাকে ধনুষ্টঙ্কারের "য়্যাণ্টিটক্সিন্" (Tetanus anti-toxin) বলে। রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে এই ঔষধ সূক্ষ্মমুখ পিচকারি দ্বারা ত্বক্ নিম্নে প্রযুক্ত হইলে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। এই চিকিৎসা এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে।

*এক খণ্ড লিণ্টে বোরিক এসিডের মলম মাখাইয়া ক্ষতে লাগাইয়া রাখিবে।

হাম ও বসন্ত।

সম্ভবতঃ হাম-বসন্তও বীজাণু-ঘটিত পীড়া। তবে ইহাদের বীজাণু এত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণের সাহায্যেও আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না*। ষোড়শ খৃষ্টাব্দে হাম সর্ব্বপ্রথমে লোহিত সাগরের উপকণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে। শীত ও বসন্তকাল ইহার প্রকৃষ্ট সময়। শিশুদিগের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। তবে কোন কোন সময় প্রাপ্ত-বয়স্কদিগেরও এই পীড়া হইতে দেখা যায়। বালিকা অপেক্ষা বালকরাই ইহা দ্বারা অধিক সময় আক্রান্ত হয়।

হামের বীজ দেহপ্রবিষ্ট হইবার পর দশ হইতে ত্রয়োদশ দিবসের মধ্যেই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সার্ টমাস্ ওয়াটসন্ বলেন, চতুর্দ্দশ দিবসেও অনেকের রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। সর্দ্দি, কাসি, জ্বরভাব, নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব প্রভৃতি এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। পরে হঠাৎ একদিন শরীরের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সচরাচর জ্বর প্রকাশের পর দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিনে "ইরাপ্‌শন্"

*অনেকে মনে করেন, এই সকল রোগের বীজাণু পুষ্পরেণুর ন্যায় ;—কারণ রোগীর গৃহ হইতে যে দিকে যখন বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকের অধিবাসীরাই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বদাই দেখা যায়।

বাহির হয়। এই ইরাপ্‌শন্‌ প্রথমে মুখমণ্ডলে বাহির হইয়া ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইতে থাকে।

সুজাত-হামের আকার দেখিতে লালবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিষার ন্যায়। প্রায়ই সাত হইতে দশ দিবসের মধ্যে উহারা অদৃশ্য হইয়া যায়।

হামের দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্য অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়। উদরাময় এই রোগের সহচর। কাহারও কাহারও এই উপদ্রবটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া পড়ে। অত্যন্ত জ্বর, বিবমিষা, কাসি, স্বরভঙ্গ ও অন্যান্য দুর্লক্ষণ সংযুক্ত এক প্রকার হাম আছে। ডাক্তারেরা তাহাকে "Malignant measles" বলেন। ইহারা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ; এই দুষ্ট হাম অল্প অল্প এবং অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পায় ও অদৃশ্য হয়। ইহা প্রথমে হামরূপে প্রকাশ পাইয়া পরে বিষম আকার ধারণ করে। কোন কোন সময় ইহা দ্বারা অনেক লোকের জীবন নষ্ট হয়।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা জনগহন সহরে হামরোগে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। হাম ভালরূপ বাহির না হইলে তাহাকে চলিত কথায় "হাম লাট্‌ খাওয়া" বলে। হাম এইরূপ "লাট্‌ খাইলে" বিশেষ আশঙ্কার কারণ হয়।

এই রোগ স্পর্শাক্রামক*; এক সময়ে বহু লোকের ইহা হইতে দেখা যায়। বাড়ীতে কাহারও হাম হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ এক পৃথক ঘরে রাখিবে। সংস্পর্শে ও বস্ত্রাদি

*খোস, পাচড়া, দদ্রু প্রভৃতি রোগও স্পর্শাক্রামক।

সংযোগে* এই ব্যাধি-বীজ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। সুতরাং বাড়ীর সুস্থ বালকবালিকাগণকে রোগীর সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে। যতদিন রোগীর কাসি ও গায়ের ছাল উঠা আরোগ্য না হয় ততদিন তাহাকে পৃথক বাস করানই সুব্যবস্থা। স্নান ও শরীরে তৈল মর্দ্দন দ্বারা এই রোগের স্পর্শাক্রামকতা অনেকটা বিনষ্ট হয়। এই জন্য আমাদের দেশে রোগান্তে "আরোগ্য-স্নানের" ব্যবস্থা আছে।

বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক। এই ব্যাধি ভারতে চিরপরিচিত। এতদ্দেশে একটি কিংবদন্তী আছে যে, এই রোগ প্রথমে উষ্ট্র হইতে মানবদেহে পরিচালিত হয়। মোটকথা, এই রোগের জন্মভূমি কোথায় এবং কিরূপেই বা ইহা মনুষ্যসমাজে প্রথম প্রবিষ্ট হইল তাহা নিশ্চয়রূপে কেহই বলিতে পারেন না। তবে অনেকে বলেন ইহা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া তথা হইতে দেশান্তরে সম্প্রসারিত হয়। বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "শীতলা" স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসীর পূজার্হ হইয়া আছেন। খৃষ্ট জন্মাইবার প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও বসন্ত এদেশবাসীর উপর আধিপত্য করিয়াছে।

এই পীড়ায় চর্ম্মে মসূর-সদৃশ "ইরাপ্‌শন্" বাহির হওয়ায়

* বসন্তের বীজও বস্ত্রাদির সাহায্যে দূরতর স্থানে চালিত হয়। প্রবাসী বসন্ত-রোগীর নিকট হইতে পত্রের সহিত রোগ-বীজাণু চলিয়া আসিতে শুনা গিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে মসূরিকা বলে। এই ব্যাধি বসন্তকালেই অধিক প্রাদুর্ভূত হয়; বোধ হয় এইজন্য লোক ইহাকে বসন্ত নামে অভিহিত করিয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে অভিহিত। যথা—"পীড়ঙ্গ," "ঠাকুরাণী," "দেবী," "শীতলা," "ইচ্ছাবসন্ত," "মাতা", "ভবানী," "বাবা," "শীতলাগুটি," "বড়পীড়া," "জগদম্বা" ইত্যাদি। শুনিয়াছি সিংহলবাসীরা ইহাকে মহাব্যাধি বলে।

তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীনবাসীরা এই রোগের সহিত পরিচিত ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে আরব দেশে ইহা আধিপত্য করিতেছে। কাফ্রিগণ ইহা দ্বারা অতি সহজেই আক্রান্ত হয়; এই কারণে কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে যখন বাণিজ্যসূত্রে ভারতের সহিত আফ্রিকার ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন এই রোগ ভারত হইতে তথায় নীত হয়। ফলতঃ এ সকল অনুমান মাত্র।

এই রোগের গুপ্তাবস্থা দ্বাদশ দিবস। রোগ প্রকাশের পূর্ব্বে গাত্র-বেদনা হওয়া প্রবল জ্বর হয়। জ্বর হইবার তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে বসন্তের গুটিকা বাহির হয়। এই গুটিকা হামের ন্যায় মুখমণ্ডলে প্রথমে বহির্গত হইয়া ক্রমে দুই তিন দিবস মধ্যেই সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গুটিকার চতুষ্পার্শ্ব রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। প্রায়ই অষ্টাহের মধ্যে গুটিকা-গুলি পরিপক্ক হয় এবং ক্রমে পূয় নির্গত হইয়া দুই সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়।

সচরাচর সুজাত-বসন্ত উদ্গত হইলেই জ্বর অন্তর্হিত হয়। কোন কোন জাতীয় বসন্ত বাহির হইলেও জ্বর ত্যাগ হয় না; অধিকন্তু শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, তন্দ্রা ও বিকারের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়. ইহাকে "দুষ্ট বসন্ত" বলে। ইহার ভাবিফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্দ। ফুসফুসের প্রদাহ, পরিপাক-বিকার, চক্ষুতে ক্ষত, কর্ণ হইতে পূয় নিঃসরণ, রক্তস্রাব প্রভৃতি বসন্ত রোগের বিবিধ উপসর্গ আছে। অনেক স্থলে চক্ষুর মধ্যে বসন্ত হইয়া চক্ষু নষ্ট হয়। অত্যধিক গুটিকা নির্গত হইলে মস্তক, মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় স্ফীত হইয়া পড়ে।

এই রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ৩০। রোগীর বয়স ও উপসর্গের উপর শুভাশুভ ফল নির্ভর করে। অতি শিশু ও অতি বৃদ্ধের বসন্ত-রোগ বিশেষ ভয়াবহ। গর্ভিণীর এই রোগ হইলে গর্ভস্রাব ও মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নহে।

হাম বা বসন্তের বীজ দেহপ্রবিষ্ট না হইলে কখনই এই সকল রোগ জন্মে না। যে সময়ে রোগীর গাত্রের ছাল উঠিতে আরম্ভ হয়, তখন ঐ ছালের মধ্যে রোগ-বীজাণু অবস্থিতি করে। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, বসন্ত-রোগের বীজ দুই শত বৎসর কালও সজীব থাকিতে পারে।

হাম বা বসন্ত-রোগ কাহারও একবার হইলে ঐ ব্যক্তি আর ঐ রোগে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয় না। তবে ক্বচিৎ কাহারও কাহারও দ্বিতীয় আক্রমণের কথা শুনা যায়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশের নরপতি পঞ্চদশ লুই ৬৪ বৎসর বয়সে বসন্তরোগে

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজার একবার বসন্তরোগ হইয়ছিল। সুতরাং এই দ্বিতীয় আক্রমণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তৎকালে রাজ্য মধ্যে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। অবশেষে ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ গ্রেগরি বুঝিতে পারিলেন যে বাল্যকালে পঞ্চদশ লুই মহোদয়ের প্রকৃত বসন্ত হয় নাই; উহা পানি-বসন্ত মাত্র।

বসন্ত-বীজ দেহপ্রবিষ্ট হইলে চর্ম্ম মধ্যে প্রথমে প্রদাহ উপস্থিত হয়। পরে ঐ প্রদাহযুক্ত স্থানে গুটিকোদ্গম হইয়া থাকে। বসন্ত মধ্যে রস সঞ্চিত হইয়া যে "লিম্প" (Lymph) উৎপন্ন হয়, উহাই ঐ রোগের বীজ। ঐ বীজ অপর কোন ব্যক্তির রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহারও বসন্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের ন্যায় অন্যান্য জীবেরও বসন্ত হয়। গোজাতির মধ্যে ইহার প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট। অধুনা গো-বসন্তের বীজ লইয়া এই রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হইতেছে।

বসন্ত-রোগীকে ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া এক পৃথক ঘরে রাখা উচিত। ঐ সঙ্গে সম্ভব হইলে বাড়ীর অন্যান্য লোককে স্থানান্তরে পাঠানই সুব্যবস্থা। রোগীর গৃহ প্রশস্ত ও বায়ুপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। তথায় অনাবশ্যক দ্রব্যাদি রাখা অনুচিত। কয়েকখানি বস্ত্র কার্ব্বলিক লোশনে নিমজ্জিত করিয়া ঐ কক্ষের জানালা ও দরজায় সর্ব্বদা ঝুলাইয়া রাখিবে এবং ঘরের মেঝেটি মধ্যে মধ্যে পরিশোধক জলে ধৌত করিয়া ফেলিবে। রোগীকে সর্ব্বদা মশারির মধ্যে রাখিতে ভুলিবে না;

কারণ বসন্তের ক্ষতে মক্ষিকাদি বসিয়া রোগ-বিস্তার করিতে পারে। রোগীকে যত্র তত্র কফ-কাসাদি ফেলিতে দেওয়াও নিষিদ্ধ। একটি পাত্রে পরিশোধক জল রাখিয়া উহাতেই কফ-কাস নিক্ষিপ্ত করিতে উপদেশ দিবে।

রোগী নিরাময় হইলেও তাহাকে কিছুকাল পৃথক বাস করাইবে। সুস্থ সঙ্গে আসিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ দুই তিনবার কোন পরিশোধক জলে তাহাকে স্নান করাইয়া লইবে*। তাহার ব্যবহৃত শয্যা, বস্ত্র, রুমাল, ভোজন-পাত্র প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। তদভাবে পরিশোধক জলে নিমজ্জিত ও ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিবে†। বসন্ত-রোগীর গৃহ কার্ব্বলিক লোশনে বা তদ্বৎ কোন জলে উত্তমরূপে ধৌত ও চূণকাম না করিয়া ব্যবহার করিবে না।

যাহারা অল্পদিন হইল টিকা গ্রহণ করিয়াছে অথবা যাহাদের একবার বসন্তরোগ হইয়াছে, এমন লোকই এই রোগীর পরিচর্য্যা করিবার উপযুক্ত পাত্র। সংক্রামক রোগীর পরিচর্য্যা করিতে হইলে যে সকল নিয়ম অবশ্য প্রতিপালন করিতে হয়, এই রোগীর পরিচর্য্যাকারী সে গুলি মান্য করিতে কদাচ ভুলিবে না। রোগীর গৃহে অপর লোক প্রবেশ করা উচিত নহে। যদি

---

*আমাদের দেশে "আরোগ্য-স্নানের" সময় বিল্বপত্রসহ হরিদ্রা বাটিয়া গাত্রে লেপন করা হয়। ইহা দ্বারা রোগ-বীজ বিনষ্ট হইতে পারে।

†রোগীর শয্যা-বসনাদি বিষনাশক জলে ধৌত না করিয়া রজকালয়ে পাঠাইতে নাই।

প্রবেশ করিতে হয়, তবে একখানি মোটা চাদর দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া প্রবেশ করিবে এবং বাহিরে আসিবার সময় ঐ চাদরখানি গৃহের দরজায় রাখিয়া হস্ত পদাদি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া স্থানান্তরে যাইবে।

রোগীর গাত্রে কার্ব্বলিক তৈল মাখাইয়া রাখিবে*। ইহাতে রোগ-যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়, দ্বিতীয়তঃ ক্ষতমধ্যস্থ রোগ-বীজও বায়ুতাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না।

টিকাগ্রহণই বসন্তের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। বাড়ীতে বা গ্রামে বসন্ত দেখা দিলে কাল বিলম্ব না করিয়া সকলেই টিকা গ্রহণ করিবে। বাল্যকালে একবার টিকা হইয়াছে বলিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবে না।

পূর্ব্বকালে এ দেশে বসন্ত-রোগাক্রান্ত মানুষের বীজ লইয়া টিকা দিবার পদ্ধতি ছিল। উহাকে "ইন্‌অকুলেশন্" বলা হইত। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই "ইন্‌অকুলেশন্" টিকা টার্কির কনষ্টাণ্টিনোপল নামক স্থানে সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হয়। কিন্তু এই টিকা অনেক সময় মারাত্মক হইয়া উঠিত। এজন্য ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট উহার পরিবর্ত্তে "ভ্যাক্‌সিনেশন্" অর্থাৎ গো-বসন্তের টিকা দিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে প্রথম "ভ্যাক্‌সিনেশন্" (Vacci-

*কার্ব্বলিক এসিড ১ ভাগ অলিভ অয়েল (তদভাবে নারিকেল ৯ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

nation) আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত ডাক্তার জেনার মহোদয় ইহার প্রবর্ত্তক। আজ সেই চিরস্মরণীয় জেনারের কৃপায় ছুরিকার অগ্রভাগে এক বিন্দু গো-বীজ লইয়া আমরা ভীষণ মানবশত্রু বসন্ত-রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

বসন্ত-বীজ দেহমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া এই দুষ্ট ব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা প্রাচীন মিসর, চীন, তাতার প্রভৃতি দেশবাসীরাও করিত। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা অবলম্বিত হইত; চীন দেশে পূয়ের পরিবর্ত্তে গুটিকার কচ্ছু নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করান হইত। স্কট্‌লণ্ডে সুস্থ শিশুকে বসন্ত-রোগীর সহিত এক শয্যায় রক্ষা করা হইত। কোন কোন স্থানে বসন্ত-রোগের পূয়সংযুক্ত সূত্র শিশুর হস্তে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। আবার কোথায় বা বসন্তের শুষ্ক কচ্ছু শিশুর কোমল হস্তে অথবা পদতলে ঘর্ষণ করিবার রীতি ছিল।

শরীর সুস্থ থাকিলে প্রত্যেক তিন মাস বয়স্ক শিশুকে টিকা দেওয়া উচিত। পঞ্চম বৎসর বয়সে এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে আবার টিকা গ্রহণ করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বসন্তের "এপিডেমিক্" সময়ে কালাকাল বিচার না করিয়া সকলের পক্ষেই নূতন টিকা গ্রহণ করা সমীচীন*।

---

*আঁতুড়ে শিশু ও গর্ভিণী সকলেই নিরাপদে টিকা লইতে পারেন। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে স্থলে টিকা দেওয়া শিশু বসন্ত-রোগে একটি মরে, সেই স্থলে টিকা না দেওয়া শিশু ৪৪০টি মারা যায়।

অনেক পল্লীগ্রামে প্রথমতঃ গো-বীজে একটি শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। পরে ঐ শিশুর বসন্ত হইলে তাহার হস্ত হইতে বীজ লইয়া আবার অন্য শিশুকে প্রদত্ত হয়। এ প্রথা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। যে শিশুর বীজ গ্রহণ করা হয় তাহার শরীরে উপদংশাদি রোগ থাকিলে ঐ রোগ-বিষ সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। এই দোষ নিবারণের জন্য আজকাল প্রত্যেক স্থানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যথেষ্ট পরিমাণে গো-বীজ প্রেরিত হইতেছে।

কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, গর্দ্দভ-দুগ্ধ এই রোগের প্রতিষেধক। রোগের প্রাদুর্ভাবকালে প্রত্যেক লোক অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমাণ এই দুগ্ধ পান করিলে বসন্তের কবল হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। কেহ কেহ উচ্ছে খাইতে উপদেশ দেন। কাহারও কাহারও মতে কণ্টীকারির মূলই উত্তম প্রতিষেধক। কিন্তু টিকা গ্রহণের ন্যায় আর কোন ব্যবস্থাই এই রোগের সুনিশ্চিত প্রতিষেধক নহে।

পরিশিষ্ট।

কার্ব্বলিক লোশন---কার্ব্বলিক এসিড ১ ভাগ, উষ্ণজল ২০ ভাগ।

পারক্লোরাইড লোশন—পারক্লোরাইড অব্ মার্কারি (রসকর্পূর) ১ ভাগ, জল ১০০০ ভাগ।

কণ্ডিস্ ফ্লুইড্ লোশন—পটাস পারম্যাঙ্গানেট্ ১ ড্রাম বা ৬০ গ্রেণ, জল ১ পাইণ্ট।

রোগীর বস্ত্রাদি এবং ঘরের আসবাবপত্র বিশোধন-কার্য্যে ইহারা ব্যবহৃত হয়।

যে পাত্রে রোগী কফ-কাসাদি নিক্ষেপ করে, সে পাত্রমধ্যেও কার্ব্বলিক লোশন, পারক্লোরাইড লোশন অথবা কণ্ডিস্ ফ্লুইড লোশন—ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি জীবাণু-নাশক জল রাখা যায়।

রোগীর পরিচর্য্যাকারিগণ নিজ হস্ত ও পরিধেয় বসনাদি প্রথমে সাবান-জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পুনরায় উপরি উক্ত যে কোন একটি ঔষধ-জলে ধৌত করিয়া লইবে।

আইজাল্ লোশন—আইজাল্ (Izal) ১ ভাগ, জল ২০০ ভাগ।

ফেনাইল লোশন—ফেনাইল ১ ভাগ, জল ১০০ ভাগ।

রোগীর ঘর, মল-মূত্র ত্যাগের স্থান এবং বাড়ীর ড্রেণ প্রভৃতি দোষশূন্য করিবার জন্য এই দুইটি লোশন সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়।

প্রচুর পরিমাণে কলিচূণ গুলিয়া ঢালিয়া দিলেও ঐ সকল স্থান নির্দ্দোষ হইতে পারে।

বারনেট্ ফ্লুইড—এক ড্রাম জলে ৫ গ্রেণ ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক মিশাইলে যে লোশন হয় তাহাকেই বার্নেট্ ফ্লুইড বলে।

ইহাও নর্দ্দামা—পাইখানা এবং রোগীর শয্যা-বসনাদি শোধনার্থে উত্তম।

গন্ধক দ্বারা গৃহশোধন—জনশূন্য ঘরের দরজা, জানালা আবদ্ধ করিয়া গন্ধক পুড়াইবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে ঘর আর না খুলিলেই ভাল হয়। পরে বায়ু গতায়াতের জন্য কয়েক দিন ঘর খুলিয়া রাখিয়া চূণকাম করিয়া ব্যবহার করিবে।

হাজার কিউবিক্ ফুট্ স্থান শোধন করিতে অর্দ্ধ হইতে এক সের গন্ধক আবশ্যক হইতে পারে।

সমাপ্ত।